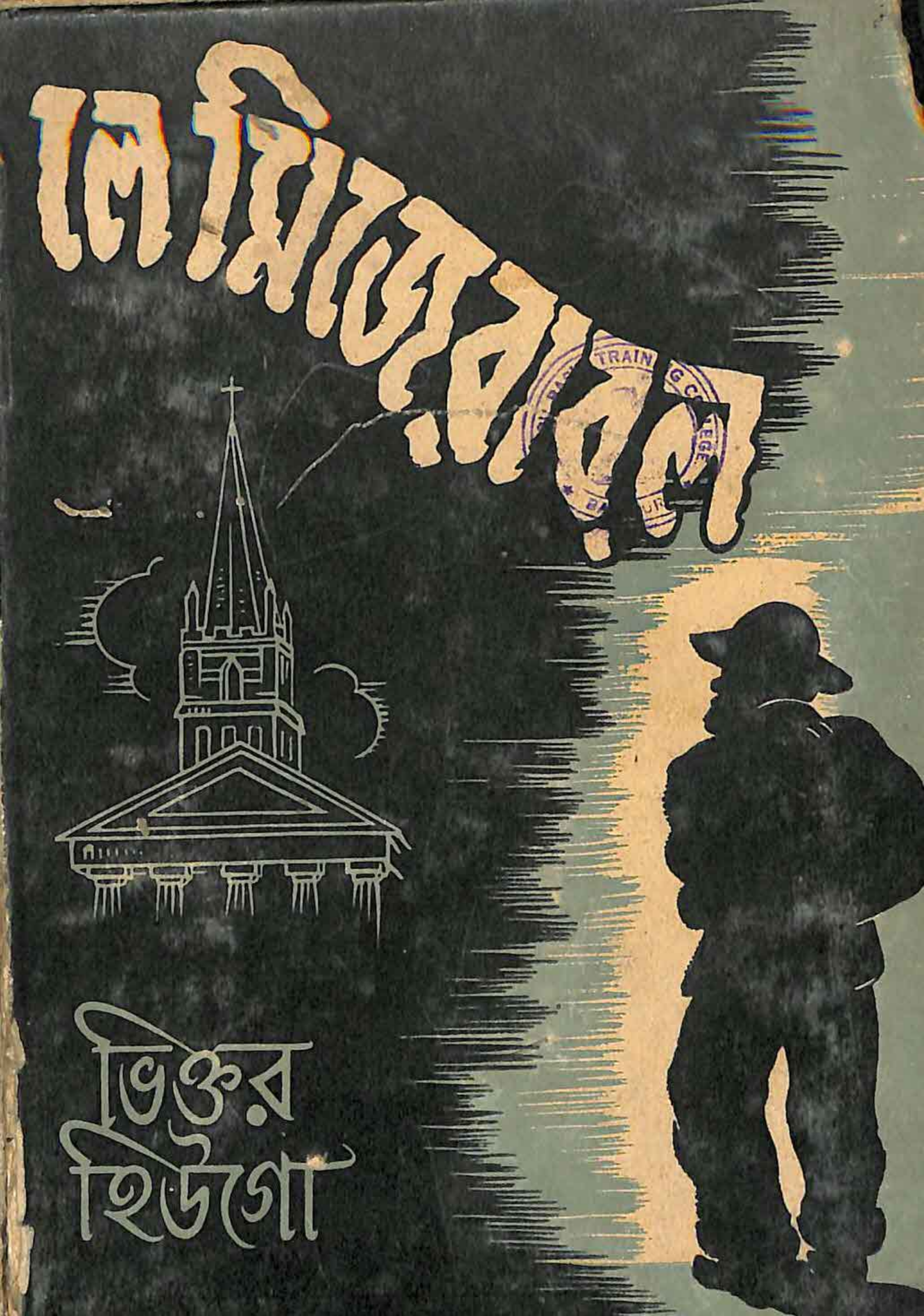

লে মিজেরাবল
ভিক্টর হিউগো

ভিক্তর হিউগোর

লে মিজেরাবল্

[সংক্ষেপিত]

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

"কত-কথা"
৬৮।২, মির্জাপুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক
ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত
"কত-কথা"
৬৮।২, মির্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীকালীশঙ্কর বাক্‌চি
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং লিঃ
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস
৩৮এ, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ
আশ্বিন, ১৩৫৭

দাম দুই টাকা

বাইণ্ডার—ভট্টাচার্য্য কোম্পানী
২৪এ, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা

নিবেদন

প্রায় চোদ্দ বছর আগে বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস 'লে মিজেরাব্‌ল্‌' বাঙ্‌লা কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে সঙ্কলন করেছিলাম। সেই সংক্ষেপিত সংস্করণ বাঙ্‌লার কিশোর-কিশোরীদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। তার প্রমাণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয় নি।

বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে উক্ত সংস্করণের আকারে ও প্রকারে অনেক প্রভেদ। পরিবর্ধিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয় চার-পাঁচ বছর আগে। সে সংস্করণের বইগুলিও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। এবারেও কিছুটা অদল বদল করেছি।

একদিন বাঙলার কিশোরদের এ গ্রন্থ আনন্দ দিয়েছে, এবারেও দেবে, এই ভরসা রইল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্বিন, ১৩৫৭

উৎসর্গ

দেওয়ানজী এণ্ড ব্রাদার্স (আনলিমিটেড্)



পথে পথে

এক

ফরাসী দেশের ছোট্ট একটি শহর, নাম ডি—। ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে এক দিন দেখা গেল রাজপথে একটা লোক ধীর মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছে। পথ দিয়ে অমন কত লোকই ত চলাফেরা করে। কিন্তু এ মানুষটি একটু আলাদা রকমের। দেখলেই মনে হয়, ওর দেহের গড়ন খুব মজবুত। বয়সের ঝড়ঝাপটায় বিশেষ কিছু অপচয় হয়নি। লোকটি বেঁটে, বয়স চল্লিশ পার হয়েছে; তবে দেখলে মনে হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাত-পায়ের হাড়গুলো বেশ মোটাসোটা। একমুখ দাড়ি-গোঁফ। নাকটা বেশ থ্যাবড়া, যেন হাঁসের ঠোঁট। মাথায় একটা অতি জীর্ণ পুরোনো টুপি, গায়ের কোটটার রং দাঁড়িয়েছে কালোর সঙ্গে ধুলো মেশালে যে রং হয়, ঠিক তেমনটি। পিঠে ও কনুইয়ের কাছে ক'জায়গায় বিচিত্র রঙের তালি। কোটের নীচে আধ-ময়লা ছেঁড়া একটা শার্ট আছে বটে, তবে একটাও বোতাম নেই। লোকটির বুকখানি বেশ চওড়া, শার্টের ফাঁকে দেখা

যাচ্ছে ভালুকের গায়ের মত লোমে ভরতি। পা-জামার অবস্থাও অনুরূপ। পায়ে মোজার বালাই নেই, তবে এক জোড়া ছেঁড়া জুতা আছে। জুতার তলায় লোহার নাল দেওয়ায় চলবার সময় খট্ খট্ শব্দ হয়। হাতে একখানা মোটা মজবুত লাঠি। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা, কিন্তু দাড়ি-গোঁফ বেশ লম্বা। সৈন্যদের কাপড়ের থলের মত একটা বোঝা তার পিঠে আঁট করে বাঁধা, তার ভিতর ওর আবশ্যক জিনিস-পত্র আছে। বেচারা সারা দিনই হাঁটছে হয় ত। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে, তার উপর ধুলো-বালি পড়ে তাকে আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছে। রাস্তায় তখনও আলো জ্বলে নি, সন্ধ্যে হতে আরও কিছুটা দেরি আছে।

কেউ তাকে চেনে না। কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে—কে জানে! সারা দিনই পথ চলছে বলে মনে হয়। কেন না, তাকে নিতান্ত ক্লান্ত বলেই মনে হচ্ছিল।

পথ চলতে চলতে একটি হোটেল দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কি ভেবে নিয়ে একবার এদিক ওদিক চাইল, তারপর সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ল।

হোটেলের মালিক স্বয়ং রান্নাবান্না করে। রান্নাঘরের চুল্লীতে তখন গন্‌গনে আগুন জ্বলছে; রান্নাও চলছে। পাশের ঘরে মনে হল যেন কারা সব গল্পগুজব করছে, কেউ কেউ বা সুর সাধছে। হোটেল-ওআলা হয় ত তাদের জন্যেই খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত।

দরজা ঠেলে লোকটিকে ঘরে ঢুকতে দেখে হোটেল-ওআলা প্রশ্ন করল, 'কি চাই?'

লোকটি জবাব দিল, 'খাবার চাই।—আর সেই সঙ্গে মাথা গুজবার মত একটু জায়গা।'

হোটেল-ওআলা মুখ তুলে চেয়ে লোকটিকে ভালকরে একবার

দেখল, দেখে তার কেমন যেন একটু সন্দেহ হল। বলল, পয়সা-কড়ি কিছু আছে ত?'

'আছে বই কি!'—বলে সে তার পকেট হাতড়ে একটি চামড়ার ছোট্ট থলে বার করে দেখাল।

'বেশ, তা হলে ওখানে বসো। খাবার তৈরি হলেই পাবে।' মালিক জবাবে বলল।

থলেটা সে বের করল বোধ করি পয়সা-কড়ি তার আছে, তাই জানাবার জন্যে। কারণ, সেটা সে সঙ্গে সঙ্গেই পকেটে রেখে দিয়ে দরজার পাশে একটা টুলে গিয়ে বসল। থলেটা টুলের পাশে নামিয়ে রেখে হাতের লাঠিগাছটা দুহাতে চেপে ধরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'রান্না হতে কি খুব দেরি হবে?'

'না, দেরি কেন হবে? এই ত হল বলে।'—বলেই হোটেল-ওআলা তার টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। টেবিলের দেরাজ থেকে একটা পেন্সিল কুড়িয়ে নিয়ে সেদিনকার খবরের কাগজের কোণের দিকের একটু সাদা অংশ ছিঁড়ে তাতে খস্‌ খস্‌ করে কি যেন দু-লাইন লিখল, পরে সেই কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে ডেকে উঠল, 'ছোকরা!'

সঙ্গে সঙ্গে বার-চোদ্দ বছরের ছোট্ট একটি ছেলে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হোটেল-ওআলা তার হাতে সেই কাগজের টুকরোটি দিয়ে কানে কানে কি যে বলল কিছুই বোঝা গেল না। তবে ছেলেটি ছুটে টাউন হলের দিকে বেরিয়ে গেল।

হোটেল-ওআলা চেয়ে দেখল, লোকটি তখনও ঠিক তেমনি করেই চুপচাপ বসে আছে। বসে বসে ঢুলছে।

ছেলেটার ফিরতে দেরি হল না। খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল এবং আর একটা কাগজের টুকরা মনিবের হাতে দিয়ে সেখান থেকে ...রে গেল।

চিরকুটের লেখাটুকু পড়েই হোটেল-ওআলা আপন মনে একবার মাথা নেড়েই বলে উঠল, 'হুঁ !'

খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়াল। আগন্তুক যেখানে বসে বসে ঝিমুচ্ছে, ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে বলল, 'ওহে, শুনছ? থাকবার খাবার সুবিধা—উহুঁ, এখানে কিছু হবে-টবে না বুঝলে বাপু?'

'তার মানে?'—বলেই সে মুখ তুলে চাইল। 'ভেবেছেন আমার টাকাকড়ি কিছুই নেই? বলেন ত আগাম দিচ্ছি।'

'না, না, তা—তা নয়।'

'তবে?'

হোটেল-ওআলা তখন কেমন যেন একটু আমতা-আমতা করে বলে উঠল, 'কথাটা কি জান, ভেবে দেখলাম, আমার এখানে তোমার জায়গা হবে না।'

'বেশ, আপনার ওই আস্তাবলের একধারে আমি পড়ে থাকব।'

'উহুঁ, তা হয় না।'

'কেন হবে না?'

'ঘোড়া রাখতেই সব জায়গা জুড়ে যাবে।'

লোকটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'খুব হবে। যেখানে হোক জায়গা একটু করে নেবো, তার জন্য ভাবতে হবে না। ওই সিঁড়ির ধারে, নয় ত, এই খানেই। এক আঁটি খড় দিতে পারবেন ত? যাক, সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না, আগে খেতে দিন চারটি।'

হোটেল-ওআলা মাথা নেড়ে জবাবে বলল, 'না খাবারও তোমাকে আমি দিতে পারব না।'

সোজা স্পষ্ট জবাব।

লোকটি উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার কথাটা কি একবার ভেবে

দেখেছেন? খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি দাঁড়াতেও আর পারছি নে। ভোর থেকে বার মাইল পথ হেঁটে এসেছি, সারা দিন কিচ্ছু খাইনি।'

হোটেল-ওআলা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'কি করব, কোন উপায় নেই।'

লোকটা এবার পাগলের মত হো হো করে হেসে উঠল। বড় বড় পাত্রে যেখানে খাবার ঢাকা ছিল সেদিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল, 'ওগুলো কি?'

'ও সব অন্যের জন্যে। দেখছ না পাশের ঘরে লোকজন সব রয়েছে।'

'কয় জন?'

'বার জন।'

'মাত্র বার জন! আর ওই অত খাবার, কুড়ি-পঁচিশ জন খেয়েও ফুরোতে পারবে না।'

বলেই সে আবার টুলের উপর গিয়ে বসল। বলল, হোটেলে যখন এসে পড়েছি আর খিদে পেয়েছে, তখন না খেয়ে আমি এক-পাও নড়ব না।'

হোটেল-ওআলা বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আচ্ছা মানুষ ত! নড়বে না কি রকম! ওঠো বলছি!'

লোকটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হোটেল-ওআলা হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে বলে উঠল, 'খুব হয়েছে! থাম! ভেবেছ তোমাকে আমি চিনতে পারি নি, না? বলব তোমার নাম, বলব তুমি কে? দেখবা মাত্রই সন্দেহ হয়েছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁড়িতে খবর নিতে পাঠিয়েছিলাম। দেখবে তারা কি বলে পাঠিয়েছে? এই দেখ, পড়। পড়তে জান ত?'

এই বলে কাগজের টুকরাটি তার হাতে দিয়ে হোটেল-ওআলা

বলল, 'কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। বুঝতে পেরেছি, তুমি জঁা ভালজঁা। বাস্, এবার ওঠো।'

লোকটি আর একটি কথাও বলল না। মাথা নীচু করে তার সেই ঝোলাটি তুলে নিয়ে সত্যি সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, তার পর অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে একবার হোটেল-ওআলার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার সেই পথ! কোথায় যাবে, কোথায় গেলে চারটি খেতে পাবে, কে তাকে আজিকার এই শীতে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দেবে,—এই তার একমাত্র চিন্তা।

ভাবতে ভাবতে সে পথ চলতে লাগল।

বড় হোটেল থেকে তাকে তাড়িয়ে দিল, এখন কি ছোট-খাটো কোন হোটেলে গেলে তার আশ্রয় মিলবে? দেখা যাক। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? রাত্রি হয়ে আসছে, খিদেও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে।

পথের ধারে ছোট্ট একটি হোটেল। ঘরের মধ্যে মিটমিট করে একটি আলো জ্বলছে।

যা থাকে কপালে বলে ভাল্‌জঁা সেখানে ঢুকে পড়ল। ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, 'কে?'

'এখানে খাবার মিলবে? আর রাত্রির মত একটু জায়গা?'

'হাঁ, মিলবে। ভিতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকতেই সব কয়জোড়া চোখই তার দিকে নিবদ্ধ হল। চেয়ে থাকবার মতই চেহারাখানা বটে! তা হোক, মালিক বলল, 'বসুন এখানটায়। খাবার আনছি।'

চওড়া একখানি বেঞ্চি ঘরের একপাশে পাতা ছিল। ঝোলাটা নামিয়ে একটু আরাম করে পা ছড়িয়ে লোকটি বলে উঠল, 'আঃ এতক্ষণে যেন বাঁচলাম!'

ঘরের ভিতর যে কয়জন লোক বসেছিল তাঁদের মধ্যে যে লোকটা মোটামত সে মাছের ব্যবসা করে। তাকে প্রায়ই দু-একদিন অন্তর গ্রাম থেকে শহরে আসতে হয়। ঘোড়ায় চড়ে আসা-যাওয়া করে। বড় হোটেলে থাকার খরচ বেশি, তাই থাকে সে এখানেই। তবে ঘোড়াটা রাখবার জায়গা এখানে হয় না। খানিক আগে জাঁ ভাল্‌জাঁকে যে হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেই হোটেলের আস্তাবলে সে তার ঘোড়াটা এক্ষুনি রেখে এল।

হোটেল-ওআলা বোধ করি ভাল্‌জাঁর জন্য খাবার আনতেই যাচ্ছিল, এমন সময় এই মাছের ব্যবসায়ীটি হাতের ইসারায় তাকে বলল, 'শোন!'

হোটেল-ওআলা তার কাছে আসতেই সে তার কানে কানে কি যেন বলল।

বস্‌! হোটেল-ওআলা তৎক্ষণাৎ জাঁ ভাল্‌জাঁর সামনে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'না বাপু, এখান থেকেও তোমাকে সরতে হচ্ছে।'

আরাম পেয়ে ভাল্‌জাঁ হয় ত ঘুমিয়েই পড়েছিল। আচম্‌কা চমকে উঠে বলল, 'কি, খাবার দিয়েছ?'

'না, তোমার এখানে থাকা চলবে না, আর কোথাও যাও।' হোটেল-ওআলা বলল।

'ও, তা হলে তোমরাও জানতে পেরেছ?'

'হাঁ, আমরাও জানি।'

'কিন্তু দেখ, আর একটা হোটেল থেকেও আমাকে ঠিক এমনি করেই তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'আমরাও দিচ্ছি।'

'তা হলে আমি এখন যাই কোথায়?'

'তা আমি কি জানি!' হোটেল-ওআলা পিঠ পিঠ জবাব দিল।

জঁা ভাল্‌জঁা উঠে দাঁড়াল। আবার সেই ঝোলাটি পিঠে চাপিয়ে লাঠিগাছটি হাতে নিয়ে সে পথে নেমে এল।

আগেকার হোটেল থেকেই গোটা কয়েক দুষ্টু ছোকরা তার পিছন নিয়েছিল, এবার তারা তার গায়ে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল।

ঢিল খেয়ে সে পথের মাঝখানে পিছন ফিরে একবার রুখে দাঁড়াল, লাঠিগাছটি দেখিয়ে বলল 'আয়, তোদের মজা দেখাচ্ছি।'

যেই শোনা, অমনি ছেলের দল ভোঁ দৌড় মারল।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা লোহার ফটকওআলা বাড়ী। ভাল্‌জঁা দেখেই চিনতে পারল যে, সেটা কারাগার। কারাগারে আশ্রয় পাওয়া যায় না? কিন্তু না, সে জানে, সেখানে আশ্রয় পেতে হলে আগে একটা বড় রকমের অপরাধ করতে হবে।

সে পথ ছেড়ে ভাল্‌জঁা অন্য পথ ধরল। পথের দু পাশে ছোট ছোট বাগান, আর তার মাঝখানে এক একটি বাড়ী। বাড়ীগুলোর দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে সে পথ চলতে লাগল। প্রত্যেকটি বাড়ী চমৎকার, ছবির মত ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। দোতলায় আলো জ্বলছে।

একতলা একটি বাংলোর মত বাড়ী দেখে ভাল্‌জঁা থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। জানলায় পর্দা ঝুলছে। একটা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে জিনিস-পত্র বেশ পরিপাটি করে সাজানো গুছানো, একটা জানলার ধারে একটি দোলনা ঝুলছে, মেঝের উপর একটা সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিল, চার ধারে খান কয়েক চেয়ার। দেয়ালে একটা দো-নলা বন্দুক।

ঘরের এক পাশে বসে আছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তার কোলে

একটি ছোট্ট শিশু। পাশেই এক যুবতী বসে—তার কোলেও একটি শিশু, শিশুটি মাই খাচ্ছে। ছেলে দুটি খিল খিল করে হাসছে, কলগুঞ্জন করছে। তাদের মা হাসছে, বাবাও হাসছে। ঘরের ভিতর আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে।

জ্যাঁ ভালজ্যাঁ মনে মনে ভেবে দেখলে, এত আনন্দ, এত সুখশান্তি যেখানে, সেখানে হয় ত বা একটু আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে।

এই মনে করে সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে খুট্ খুট্ করে দরজার কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে মহিলাটি সম্ভবত বলে উঠল, 'দেখো ত, দোরে কে যেন কড়া নাড়ছে।'

বাড়ীর কর্তা বলে উঠল 'কই, কোথায়?'

আবার শব্দ হল, মেয়েটি আবার বলল, 'ওই শোন, কড়া নাড়ার শব্দ।'

এবার আলো নিয়ে লোকটি উঠে গেল। দরজা খুলে শুধাল, 'কে?'

ভালজ্যাঁ জবাবে বলল, একজন নগণ্য পথিক। চারটি খেতে দেবেন? আর বাগানের ওই কোণে যে আপনার ছোট্ট ঘরখানি আছে, সেখানে রাত্রির মত একটু আশ্রয়?'

একটু জিরিয়ে নিয়ে লোকটা আবার আমতা আমতা করে বলল, 'অবশ্য এর জন্য আমি দাম দিতে রাজী আছি।'

ভদ্রলোক তখন হাতের আলোটি আর একটু তুলে ধরে তাকে দেখতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করল 'তুমি কে?'

'আমি একজন পথিক। অনেক দূর থেকে এসেছি। সারাদিন পথ চলেছি। প্রায় বার মাইল হেঁটেছি। দাম দিলেও কি আমাকে একটু জায়গা দেবেন না?'

'পয়সাই যদি খরচ করবে ত হোটেলে গেলে না কেন?'

'হোটেলে জায়গা নেই।'

'জায়গা নেই? বল কি হে? অসম্ভব। এখানকার ওই যে—আহা কি নাম যেন ছাই—ওই যে হে, সেই আস্তাবল-ওআলা বড় হোটেলটায় গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'কি হল সেখানে? কি বললে?—জায়গা নেই?

বলবার ইচ্ছা তার ছিল না, তবু তাকে বলতে হল। বললে, 'কেন জানি নে, তারা আমাকে দেখেই বললে—এখানে কিছুই হবে না।'

'বেশ, কিন্তু ওটা ছাড়া ত আরও ছোট ছোট হোটেল আছে, তার কোন একটায় কেন চেষ্টা করলে না?'

সে বললে আরও একটায় গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও সেই এক কথা: 'জায়গা হবে না।'

আর বেশি কিছু বলবার দরকার হল না। ভদ্রলোকের চোখে মুখে তখন সন্দেহের একটা দারুণ কালো ছাপ দেখা গেল। কেমন যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লোকটি আবার তার হাতের প্রদীপটি তুলে ধরে তাকে ভাল করে দেখতে গিয়ে বলল, 'তুমি কি সেই লোক?'

এই বলে সে ভাল্‌জাঁর দিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং তিন পা পিছিয়ে গেল। আলোটা টেবিলের উপর রেখে দেয়াল থেকে টান মেরে বন্দুকটা হাতে তুলে নিল।

এদিকে স্ত্রীলোকটিও 'তুমি কি সেই লোক' প্রশ্নটা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ও ছেলে দুটিকে জড়িয়ে ধরে তাড়াতাড়ি স্বামীর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে ভয়চকিত দৃষ্টি নিয়ে সেই খোলা-বুক লোকটির দিকে চেয়ে রইল এবং বিষম ভয় পেয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল 'ডাকাত'!

মানুষ যে দৃষ্টি নিয়ে সাপের দিকে তাকায় সে রকম ভাবে লোকটার

দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে গৃহস্বামী দরজার কাছে গিয়ে বলে উঠল, 'দূর হ!'

জাঁ ভালজাঁ মিনতি করে বলল, 'দয়া করে এক গ্লাস জল খেতে দিন।'

ভদ্রলোক বলল, 'হ্যাঁ, জল দেবে না, আরো কিছু! দেখছিস ত এটা কি?' বন্দুকটা তুলে ধরল।

বলেই হড়াম করে দরজাটা তার মুখের উপরেই ভেজিয়ে দিল। লোকটা শুনতে পেল দুটো বড় বড় হুড়কো লাগান হল। সঙ্গে সঙ্গে জানলার কপাট বন্ধ করে লোহার ছিটকিনি এঁটে দেওয়ার শব্দও বাইরে থেকে শোনা গেল।

সেখানেও কিছু হল না।

ভাল্‌জাঁ পথ চলতে চলতে খানিক দূরে গিয়ে দেখতে পেল, পথের ধারে তের্‌পল খাটিয়ে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে; রাস্তা যারা মেরামত করে তাদের যন্ত্রপাতি রাখবার জন্যে এ ধরণের ছোট ছোট সাময়িক কুঁড়ে মাঝে মাঝে তাদের বানিয়ে নিতে হয়।

খাবার ত আর আজ জুটল না। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে হলে এখানেই তাকে রাতটা কাটাতে হয়। তাই সে হামাগুড়ি দিয়ে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। হাতড়ে কতকগুলা খড়ও পাওয়া গেল। থলেটা আর লাঠিগাছটি মাথার নীচে বালিশের মত করে রেখে আরাম করে সে পা ছড়িয়ে শুতে গেল, এমন সময় দেখল, বাঘের মত প্রকাণ্ড একটা কুকুর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা হয়ত আরাম করে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, মানুষের আভাস পেতেই জেগে উঠে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

লাঠি উঁচিয়ে ভাল্‌জাঁ বার কতক কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কুকুরটা তার অধিকার ছাড়তে রাজি হল না।

তাড়ানো অসম্ভব। যতই তাকে সে তাড়াবার চেষ্টা করে ততই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তাকে তেড়ে আসে, কামড়াতে চায়।

কি মুশকিল! এখান থেকেও তাকে সরতে হল। সামান্য একটা পথের কুকুর—তারও আশ্রয় আছে, সেও ওকে একটু দয়া করবে না!

এবার সে ভেবে দেখল—আর লোকালয়ে নয়; মানুষ যেখানে আছে সেখানে সে আর যাবে না। হোক দুরন্ত শীত, তবু সে কোনও গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটাবে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় চারি দিক ভরে গেছে।

পথ চলতে চলতে দেখলে যে সে শহরের বাইরে চলে এসেছে। হু হু করে চারিদিক থেকে শীতের বাতাস বইছে। শহরের ভিতর যতক্ষণ ছিল শীতের এই সাংঘাতিক কন্‌কনানি ততক্ষণ অনুভব করে নি। দারুণ শীতের এই রাত্রে গাছতলাতেই বা বসে থাকবে কেমন করে! আশা—সে যতই দুরাশা হোক, মানুষ সহজে ছাড়তে পারে না। সে মাঝ পথে থমকে দাঁড়াল। তারপর কি ভেবে আবার পিছন ফিরে শহরের পথ ধরল। যে পথ দিয়ে শহরের বাইরে এসেছিল, এবার আর সে পথ নয়, এবারে আর একটা পথ ধরে সে অন্য দিক দিয়ে চলতে শুরু করল।

একটু দূরে গিয়েই দেখতে পেল সামনে একটা গির্জা। গির্জার আসে পাশে ছোট-বড় নানা রকমের কয়েকখানি বাড়ী। রাস্তার ধারে ছোট্ট যে বাড়ীখানার পাশ দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে হতেই একবার সেই জানলার পথে উঁকি মেরে দেখল। দেখতে পেল, ঘরের ভিতরে ছাপাখানার আসবাব-পত্র রয়েছে। হয় ত একটা ছাপাখানা। লোকজন কেউ রাত্রি বেলা থাকে বলে ত মনে হল না। বাড়ীর সদর দরজার কাছে পাথরের বেঞ্চির মত কি যেন একটা আছে।

কাছে গিয়ে দেখলে, বেঞ্চি নয়—পাথরের বেদী। ভালই হল। শোবার একটু জায়গা মিলেছে। সেই বেদীটার উপর সে পা ছড়িয়ে তখুনি শুয়ে পড়ল।

এক মিনিটও পার হয় নি, কে যেন এমন সময় মেয়েলী গলায় দূর থেকে শুধাল, 'কে ওখানে শুয়ে? কে তুমি?'

বা রে বাঃ! এখানেও তাই! ভারি রাগ হল। বলে উঠল, 'দেখতেই ত পাচ্ছ, কেউ নয়, একটা আস্ত মানুষ।'

'তা ত পাচ্ছি, কিন্তু ওখানে কেন?' বলতে বলতে সে ওর কাছে এগিয়ে এল।

ভাল্‌জাঁ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল—এক বুড়ী।

বুড়ী বলল, 'তা বাবা, এখানে শুয়ে কেন?' এই দারুণ শীতের রাত্রে এই পাথরের উপর—

'উনিশ বছর ধরে কাঠের বেঞ্চিতে শোয়া আমার অভ্যেস।'

'ও, তুমি তা হলে সৈনিক?'

'হ্যাঁ।'

'ও, বুঝেছি। তা বাবা, তুমি কোনও হোটেলে গেলে না কেন?'

'টাকা-পয়সা কিছু নেই।'

'কিচ্ছু নেই? আহা, বাছা রে আমার।'

বুড়ীর হয় ত দয়া হল। মমতা মাখা স্বরে বলল, 'দেখ বাবা, আমার কাছে দুটি আনি আছে, নেবে?'

'দাও।' বলে হাত পেতে আনি দুটি সে নিলে।

বুড়ী কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'এ দিয়ে তোমার কোন হোটেলে খাওয়া-থাকা চলবে না বাবা। তবে একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। আর তা ছাড়া, এই শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা বরফের মত এই পাথরের উপর শুয়েই বা তুমি থাকবে কেমন করে? তা দেখ, একবার

চেষ্টা করে কোন হোটেলে হয় ত পয়সা না নিয়েও গরীব বলে দয়া করে চারটি খেতে দিতেও পারে।'

'অনেক জায়গায়ই গিয়েছিলাম মা—'

'গিয়েছিলে?'

'হাঁ মা, গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ একটু জায়গা ত দিলেই না, বরং তেড়ে এল।'

বুড়ী তখন আস্তে আস্তে আরও কাছে এগিয়ে এল।

জাঁ ভাল্‌জা তখন উঠে বসেছে।

অদূরে গির্জার পাশেই পাদরী সাহেবের ছোট্ট কুঠিখানা। সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে বুড়ী জিজ্ঞাসা করল, 'ওই বাড়ী গিয়েছিলে?'

'না ত।' ঘাড় নেড়ে জবাব দিল।

বুড়ী তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ওখানে গেলে নিশ্চয় তুমি আশ্রয় পাবে, খাবারও মিলবে। একবার গিয়ে চেষ্টা করে দেখো।'

———

দুই

বিশপ তাঁর বোনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এ সময় সদর দরজায় শব্দ হল।

তিনি না উঠেই বলে উঠলেন, 'ভিতরে আসুন।'

দরজা ঠেলে যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করল তাকে আমরা আগেই দেখেছি—সে জঁা ভাল্‌জঁা।

কি একটা কাজের জন্য বুড়ী ঝি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই অদ্ভুদ লোকটিকে দেখতে পেয়ে সে চমকে পিছু হটে এল। বিশপের বোনও অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বিশপ হয় ত জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন—কি সে চায়।

কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই জঁা ভাল্‌জঁা আপনা থেকেই বলে উঠল :

'আমাকে দেখে আপনারা ভয় পাবেন না। জেল-ফেরত দাগী হলেও আমি একজন মানুষ। উনিশ বছর আমি জেলে কাটিয়ে মাত্র চার দিন আগে ছাড়া পেয়েছি। এ চার দিন আমার চলার কামাই নেই। আজই হেঁটেছি বার-তের মাইল। সন্ধ্যার একটু আগে শহরে এসে পৌঁছেছি, বড় হোটেলটায় গিয়েছিলাম। আমার ছাড়-পত্র দেখে তারা আমাকে থাকবার জায়গা দিলে না, দুটি খেতে দিতেও রাজি হল না। আর একটি হোটেল থেকেও তাড়া খেয়ে চলে এসেছি। কেউ আমাকে একটু জায়গা দিলে না। রাস্তায় একটা কুঁড়ে ঘরে কুকুর থাকে, সেখানে গিয়ে থাকবার চেষ্টা করলাম। মানুষ যেমন করে আমাকে তাড়িয়ে

দিয়েছে, কুকুরও তেমনি করেই আমাকে তেড়ে এল। সে-ও যেন আমার পরিচয় জানতে পেরেছে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কিন্তু দেখতে পেলাম, আকাশে একটিও তারা নেই, মনে হল, হয় ত বা বৃষ্টি হবে। আবার শহরে ফিরে এসে গির্জার সামনেকার ওই পাথরের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিলাম। এক বুড়ী এসে সকল কথা শুনে আমাকে এ বাড়ী দেখিয়ে দিল। তাই আমি এখানে এসেছি।'

নিজের কথাগুলি সে গড় গড়, করে বলে গেল।

বুড়ী ঝি হয় ত টেবিলের উপর চাদর বিছিয়ে খাবার ব্যবস্থাই করছিল।

বিশপ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'টেবিলের উপর আর এক প্রস্ত কাঁটা-ছুরি দাও।'

জাঁ ভাল্‌জাঁ ঝির দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, 'থামো' !

বলেই বিশপের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, 'বললাম না আমি কয়েদী ! বললাম না, এই সবে চার দিন হল আমি কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছি ! আমার জন্য অত কেন।

এই বলে সে পকেট থেকে হলুদ রঙের প্রকাণ্ড একটা কাগজ বের করল। বললে, 'এই দেখুন এই আমার ছাড়-পত্র। এটির জন্যেই কেউ আর আমাকে আশ্রয় দিলে না। দেখবেন পড়ে ?— আচ্ছা, থাক, আমিই পড়েই শোনাচ্ছি। লেখাপড়া আমি একদম জানতাম না, কারাগারেই শিখেছি। যারা লেখাপড়া শিখতে চায় তাদের জন্যে সে ব্যবস্থাও আছে সেখানে। শুনুন—

'জাঁ ভাল্‌জাঁ নাম, দেশ হল গিয়ে— থাক, সে কথা জেনে আর কি হবে ? তারপর—হ্যাঁ, উনিশ বছর জেল খেটেছে চুরি করার

জন্যে পাঁচ বছর, আর চার বার জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। দুবার পালিয়েও ছিল। ধরা পড়ে আরও চৌদ্দ বছর।—সাংঘাতিক মানুষ!' বস্, শুধু এই জন্যেই কেউ আমাকে জায়গা দেয় নি। ··· আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।'

বিশপ জবাবে শুধু বললেন, 'আপনি একটু বসুন, আগুন পোহান। এখুনি আমরা সকলে খেতে বসব। খেতে খেতেই আপনার বিছানা ঠিক হবে।'

'আপনি!' 'বসুন!' এতক্ষণে ভাল্‌জাঁ যেন হঠাৎ বুঝতে পারে। এতক্ষণ তার আকৃতি কঠোর ও ম্লান ছিল। বিশপের কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। সন্দেহ ও আনন্দে তার চেহারাখানা অনির্বচনীয় হয়ে উঠল। সে পাগলের মত বলতে লাগল, 'সত্যি? য়্যাঁ? আমাকে শুতে জায়গা দেবেন। তাড়িয়ে দেবেন না? আমি কয়েদী, জেলে ছিলাম, আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন? আমাকে 'তুই, বললেন না? লোকেরা আমাকে বলে—'দূর্ হ কুত্তা!' আমার ধারণা, আপনিও আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। সেই জন্যেই আপনাকে সব কিছু খুলে বললাম। যাই হোক, আমি ··· খেতে পাব তা হলে? বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করলেন! উঃ, উনিশ বছর—উনিশ বছর বিছানার মুখ দেখতে পাইনি!'

বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার জল ঝরতে লাগল। সে বলে চলল, 'আমাকে তাড়িয়ে না দিয়ে খেতে দিতে চাইছেন, শুতে দিতে চাইছেন! আপনি বড় দয়ালু। আচ্ছা, আপনিই কি এ হোটেলের মালিক? কি নাম আপনার?'

বিশপ জবাবে বললেন, 'আমি এ শহরের বিশপ, একজন পাদরী; এটা আমার বাসা-বাড়ী।'

ভাল্‌জাঁ বলল, 'আপনি পাদরী! বিশপ! কি মহাশয় লোক!

দিয়েছে, কুকুরও তেমনি করেই আমাকে তেড়ে এল। সে-ও যেন আমার পরিচয় জানতে পেরেছে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কিন্তু দেখতে পেলাম, আকাশে একটিও তারা নেই, মনে হল, হয় ত বা বৃষ্টি হবে। আবার শহরে ফিরে এসে গির্জার সামনেকার ওই পাথরের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিলাম। এক বুড়ী এসে সকল কথা শুনে আমাকে এ বাড়ী দেখিয়ে দিল। তাই আমি এখানে এসেছি।'

নিজের কথাগুলি সে গড়্ গড়্ করে বলে গেল।

বুড়ী ঝি হয় ত টেবিলের উপর চাদর বিছিয়ে খাবার ব্যবস্থাই করছিল।

বিশপ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'টেবিলের উপর আর এক প্রস্ত কাঁটা-ছুরি দাও।'

জাঁ ভাল্‌জাঁ ঝির দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, 'থামো'!

বলেই বিশপের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, 'বললাম না আমি কয়েদী! বললাম না, এই সবে চার দিন হল আমি কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছি! আমার জন্য অত কেন।

এই বলে সে পকেট থেকে হলুদ রঙের প্রকাণ্ড একটা কাগজ বের করল। বললে, 'এই দেখুন, এই আমার ছাড়-পত্র। এটির জন্যেই কেউ আর আমাকে আশ্রয় দিলে না। দেখবেন পড়ে?— আচ্ছা, থাক, আমিই পড়েই শোনাচ্ছি। লেখাপড়া আমি একদম জানতাম না, কারাগারেই শিখেছি। যারা লেখাপড়া শিখতে চায় তাদের জন্যে সে ব্যবস্থাও আছে সেখানে। শুনুন—

'জাঁ ভাল্‌জাঁ নাম, দেশ হল গিয়ে— থাক, সে কথা জেনে আর কি হবে? তারপর—হ্যাঁ, উনিশ বছর জেল খেটেছে চুরি করার

জন্তে পাঁচ বছর, আর চার বার জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। দুবার পালিয়েও ছিল। ধরা পড়ে আরও চৌদ্দ বছর।—সাংঘাতিক মানুষ!' বস্, শুধু এই জন্তেই কেউ আমাকে জায়গা দেয় নি। ··· আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।'

বিশপ জবাবে শুধু বললেন, 'আপনি একটু বসুন, আগুন পোহান। এখুনি আমরা সকলে খেতে বসব। খেতে খেতেই আপনার বিছানা ঠিক হবে।'

'আপনি!' 'বসুন!' এতক্ষণে ভাল্‌জাঁ যেন হঠাৎ বুঝতে পারে। এতক্ষণ তার আকৃতি কঠোর ও ম্লান ছিল। বিশপের কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। সন্দেহ ও আনন্দে তার চেহারাখানা অনির্বচনীয় হয়ে উঠল। সে পাগলের মত বলতে লাগল, 'সত্যি? অ্যাঁ? আমাকে শুতে জায়গা দেবেন। তাড়িয়ে দেবেন না? আমি কয়েদী, জেলে ছিলাম, আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন? আমাকে 'তুই, বললেন না? লোকেরা আমাকে বলে—'দূর্ হ কুত্তা!' আমার ধারণা, আপনিও আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। সেই জন্তেই আপনাকে সব কিছু খুলে বললাম। যাই হোক, আমি ··· খেতে পাব তা হলে? বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করলেন! উঃ, উনিশ বছর—উনিশ বছর বিছানার মুখ দেখতে পাইনি!'

বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার জল ঝরতে লাগল। সে বলে চলল, 'আমাকে তাড়িয়ে না দিয়ে খেতে দিতে চাইছেন, শুতে দিতে চাইছেন! আপনি বড় দয়ালু। আচ্ছা, আপনিই কি এ হোটেলের মালিক? কি নাম আপনার?'

বিশপ জবাবে বললেন, 'আমি এ শহরের বিশপ, একজন পাদরী; এটা আমার বাসা-বাড়ী।'

ভাল্‌জাঁ বলল, 'আপনি পাদরী! বিশপ! কি মহাশয় লোক!

তা হলে আপনি আমার কাছ থেকে দাম নেবেন না? এতক্ষণ চেয়ে দেখি নি, কি নির্বোধ আমি! আপনি বিশপ!'

ভাল্‌জঁা তখন পিঠ থেকে থলেটা নামাল। লাঠিগাছটি এক কোণে রাখল, ছাড়-পত্র যথাস্থানে রেখে বসে পড়ল।

বুড়ী ঝি ইতিমধ্যে টেবিলে রূপার কাঁটা-চামচ রেখে গেল।

বিশপ বললেন, 'ভয়ানক শীত, না? আচ্ছা, টেবিলটাকে ওই চুল্লীর কাছে সরিয়ে নিয়ে চলুন ত।'

আবার 'আপনি!'

'দয়া করে আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না।'

বিশপ একটু হাসলেন।

টেবিলের উপর ল্যাম্পে ভাল আলো হচ্ছিল না, বুড়ী ঝিকে সে কথা বলতেই সে অন্য ঘর থেকে রূপার দুটি বাতিদান এনে জ্বালিয়ে দিল।

জঁা ভাল্‌জঁা বলল, 'আমাকে এত সম্মান দেখিয়ে আর লজ্জা দেবেন না। আমি কে, তা ত আগেই আপনাকে বলেছি।'

বিশপ তার পাশেই বসেছিলেন। সস্নেহে তার হাতখানি ধরে তিনি বললেন, 'তুমি বলে ভালই করেছ। এ আমার বাড়ী নয়— ভগবান যীশুর। দীন দুঃখী ক্ষুধার্ত আতুরের জন্যে এ বাড়ীর দরজা চিরদিন খোলা আছে, থাকবেও। কেউ এলে এ বাড়ীতে তার নাম কি, সে কে—এসব কেউ জিজ্ঞাসা করে না। এখানে কেউ এলে তার কি প্রয়োজন কেবল তা-ই জিজ্ঞাসা করা হয়। তুমি কষ্টে পড়েছ, তোমার ক্ষুধা পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে। তুমি স্বচ্ছন্দে থাক। আমার প্রশংসা করো না। বলো না যে আমার বাড়ীতে তোমাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। যে আশ্রয় চাইবে এ বাড়ী তার। তুমি নতুন লোক, তা হলেও এ বাড়ীতে আমার চেয়ে তোমার অধিকার কম নয়। এখানে যা-কিছু আছে, সবই তোমার। তোমার নাম জানবার আমার

প্রয়োজন কি? তুমি বলবার আগেই তোমার একটি নাম আছে আমি জানতাম।'

বিস্ময়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থেকে ভাল্‌জঁা জিজ্ঞাসা করল, 'জানতেন? আপনি আমার নাম জানতেন?'

বিশপ মুচকি হেসে উত্তর দিলেম, 'হ্যাঁ, জানতাম বই-কি। জামতাম—তুমি ভাই!'

নির্বাক বিস্ময়ে ভালজঁা আবার কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে রইল। তার পর বলল, 'দেখুন, এখানে আসবার আগে ক্ষুধার জ্বালায় দাঁড়াতে পারছিলাম না, কিন্তু আপনার কথাবার্তা সব শুনে, আচরণ দেখে, সত্যি বলছি আমি—এখন আর আমার খিদেতেষ্টা কিছু নেই। কি যে হল, কিছু বুঝতে পারছি নে।'

বিশপ তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'জীবনে তুমি বড় বেশি কষ্ট পেয়েছ, না?'

'সে কথা আর বলবেন না। এমন কষ্ট কিছু নেই যা আমি জীবনে ভোগ করি নি। আমার চেয়ে সামান্য একটা পথের কুকুরও বেশি সুখে আছে। যাক, সে কথা বলে আর কোন লাভ নেই। উনিশটি বছর আমি এমনি করে কাটিয়েছি, আর পারছি নে।'

এমন সময় ঝি এসে টেবিলের উপর খাবার ধরে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কথা বন্ধ হল।

জঁা ভাল্‌জঁা গ্রোগ্রাসে খেতে শুরু করল। দেখে মনে হল, সে অনেক দিন কিছু খায় নি।

তিন

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশপ নিজে একটি বাতিদান টেবিল থেকে তুলে নিলেন, অপরটি জঁা ভাল্‌জঁাকে দিয়ে বললেন, 'চল, তোমাকে শোয়ার-ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

যে-ঘরে ভাল্‌জঁার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটি প্রার্থনা-ঘর। একপাশে পর্দা-ঢাকা একটি কামরা, সেখানেই ভাল্‌জঁার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রার্থনা-ঘরে যেতে হলে বিশপের শোয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাঁরা যখন প্রার্থনা-ঘরে যাচ্ছিলেন তখন ঝি খাওয়ার শেষে বাসন-পত্র সব ধুয়ে মুছে তাকের উপর গুছিয়ে রাখছিল। প্রতি দিনই রাত্তিরে সে নিয়মিত এ কাজ করে।

বিশপ ভাল্‌জঁাকে শোয়ার-ঘরে পৌঁছে দিলেন। একটি নতুন পরিষ্কার ধব্‌ধবে বিছানা দেওয়া হয়েছে। ভাল্‌জঁা হাতের বাতিদানটি টেবিলের উপর রাখল। বিছানা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। জীবনে এমন বিছানায় শোবার সুযোগ সে কখনও পায় নি।

বিশপ তাকে বললেন, 'নাও, এবার চুপ করে শুয়ে পড়। আশা করি, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না। কাল ভোরে চলে যাওয়ার আগে খানিকটা টাটকা দুধ খেয়ে যেয়ো। দুধ আমার কিনতে হয় না, বাড়ীতে গাই আছে।'

ভাল্‌জঁা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিশপকে আর একবার নমস্কার জানাল। কিন্তু সেই সঙ্গে হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, সে এমন একটা ব্যাপার করে বসল যে, ঝি-চাকরেরা দেখতে গেলে ভয়ে শিউরে উঠত: ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে সে বিশপের হাত দু'খানি ধ'রে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এমনি ভাবে তাকাল যে, দেখে মনে হল, সে ক্ষেপে গেল নাকি!

তার পর মোটা গলায় বলে উঠল, 'আপনি কি সত্যি আমাকে আপনার শোবার ঘরের অত কাছে থাকবার জায়গা দিলেন? আপনার মনে কি এতটুকুও ভয়-ডর নেই!'

লোকটা একবার থেমে পুনরায় শয়তানের হাসি হেসে বলতে লাগল, 'আমাকে এখানে শুতে দেওয়া উচিত কি-না তা কি বেশ ভাল করে ভেবে দেখেছেন? এমনও ত হতে পারে যে, আমি আপনাকে খুন করে ঘরের সব কিছু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে সরে পড়তে পারি? আপনাকে কে রক্ষা করবে?'

বিশপ মৃদু হেসে বললেন, 'সে ভাবনা আমার নয় বন্ধু, যিনি দুনিয়ার সকলকার জন্যে ভাবেন তিনিই আমার জন্যেও ভাবছেন।'

তারপর তিনি গম্ভীরভাবে আপন মনে প্রার্থনা-মন্ত্র আওড়ালেন এবং দুটি আঙ্‌ল তুলে লোকটিকে আশীর্বাদ করলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, লোকটা কিন্তু একবারও মাথা নোয়াল না। সোজা পিছন ফিরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিশপ যাওয়ার সময় একবার অল্পক্ষণের জন্যে প্রার্থনা করে পর্দাটা টেনে দিয়ে চলে গেলেন।

একটু পরেই বিশপ বাগানে বেড়াতে লাগলেন। প্রতিদিন রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি এমনি করে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ান। এবং সেই সময় আপন মনেই জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। আজও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হল না।

লোকটি সারাদিনের অনাহারে ও পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই পেট ভরে খেতেই তার দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

মধ্য রাত্রিতে বাগানে বেড়িয়ে বিশপ ঘরে ফিরে এলেন এবং একটু পরেই সারা বাড়ীটা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

চার

মাঝ রাত্রে জাঁ ভাল্জাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

ফ্রান্সের ব্রাই প্রদেশে এক গরীবের ঘরে জাঁ ভাল্জাঁ জন্মগ্রহণ করে। ছেলেবেলায় সে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায় নি। বয়স হলে গাছীর কাজ করে সে উদরান্নের সংস্থান করতে শুরু করে।

যাদের মনটা নরম তাদের প্রকৃতির বিশেষত্বই এই যে, তারা চিন্তাশীল হলেও বড় একটা বিষণ্ণ হয় না। জাঁ ভাল্জাঁর স্বভাবটাও ছিল সে রকম। তবে তার চেহারা থেকে এই সত্যটাই প্রমাণিত হয় যে, কোন কিছুতেই তার উৎসাহ নেই। তার চেহারায় তার মনের উৎকর্ষের কোন পরিচয়ই ছিল না। ছেলেবেলায় তার বাপ-মায়ের মৃত্যু হয়। তার মায়ের মৃত্যু হয় সামান্য জ্বরে বিনা চিকিৎসায়। তার বাবাও গাছীর কাজ করত। সে মারা যায় গাছ থেকে পড়ে। সংসারে এক দিদি ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। যতদিন তার স্বামী বেঁচে ছিল ততদিন দিদি তার অনাথ ভাইটিকে লালন পালন করে।

হঠাৎ একদিন সাতটি সন্তান রেখে ভগ্নি-পতি মারা গেল; বড় ছেলেটির বয়স তখন মাত্র আট আর সকলের ছোটটির এক বছর।

জাঁ ভালজাঁর বয়স তখন পঁচিশ। সে তখন ছেলেগুলির বাবার স্থান পূরণ করল। তাদের লালনপালনের যাবতীয় দায় তার ঘাড়েই পড়ল। এই দায়িত্বভার সে অবশ্য কর্তব্য বলেই করতে লাগল, তবে সময় সময় যে বিরক্তি প্রকাশ করে নি এমন কথা বলা যায় না। তাকে কঠোর পরিশ্রম করেই দিদির সংসার চালাতে হয়। জীবনে সে কোন স্ত্রীলোকেরই স্নেহভালবাসা পায় নি।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে রাত্রিবেলা ঘরে ফিরে সে চুপচাপ খাওয়া দাওয়া সারত। খাবার সম্পর্কেও দিদি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব শুরু করল। খাওয়ার সময় ভালজাঁ মাথা নীচু করে খায়, কোন দিকে তাকায় না, বাদ-প্রতিবাদও করে না। দিদি যখন তার থালা থেকে ছেলেদের জন্যে খাবার তুলে নিত, ও দেখেও দেখত না। রাস্তার ওপারে এক কৃষক বাস করত। ছেলেগুলির পেট ভরে না বলে তারা সময় সময় চাষীর বাড়ী থেকে মায়ের নাম করে দুধ চেয়ে নিতে শুরু করে। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে কখন কখন সে দুধও মাটিতে পড়ে যেত। মা টের পেলে ছেলেগুলিকে মারধর করত, জাঁ ভালজাঁ অবশ্য দিদিকে না জানিয়ে গোপনে দুধের দাম মিটিয়ে দিত কিন্তু প্রতিবারেই অসন্তোষ প্রকাশ করত।

গাছীর কাজ যখন চলত তখন সে দিনে আট আনা করে মজুরী পেত। তা ছাড়া, সময় সময় দিনমজুরের কাজও করত। ঘাস শুকানো, গরু চরানো ইত্যাদি যখন যে কাজ পেত তখনই সে কাজ করত। দিদিও কাজ করত কিন্তু অতগুলিকে খাওয়াতে তাদের দু ভাই-বোনের উপার্জন যথেষ্ট ছিল না। তাই এই অশান্তিময় অভাবের সংসার ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলল। একবার খুব শীত পড়ল, ভালজাঁ কাজ পেল না। সংসারে অনাহার শুরু হল।

ওদের বাড়ীর পাশে এক রুটিওআলা থাকত। প্রতিদিনই সে জানলার ধারে রুটি সাজিয়ে রাখে, পরদিন প্রাতে সেই রুটি বিক্রি করে। রবিবার, রাত্রি হয়েছে, খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুটিওআলা শোয়ার আয়োজন করছে। এমন সময় শুনতে পেল জানলার কাচের উপর কিসের শব্দ। কাছে গিয়ে দেখে জানলার কাচ ভেঙে গেছে, সেই ফাঁক দিয়ে একখানা হাত ঢুকিয়ে কে রুটি চুরি করছে। রুটিওআলা কাছে আসতেই হাতখানি সরে গেল এবং চোর প্রাণপণে

দৌড়তে শুরু করল। রুটিওআলাও চোরের পিছন ছুটল। চোর ধরা পড়ল। যদিও তার হাতে তখন রুটি নেই কিন্তু কাচ ভাঙতে গিয়ে হাতের দু-তিন জায়গায় কেটে গেছে। চোর আর কেউ নয়—জাঁ ভাল্‌জাঁ।

বিচারে ভালজার বিরুদ্ধে চুরির অপরাধ প্রমাণিত হতে দেরি হল না। তা ছাড়া, ভাল্‌জাঁ সময় সময় নিজের বন্দুক নিয়ে শিকার করত। কাজেই প্রমাণ হতে দেরি হল না যে, ভাল্‌জাঁ একজন সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক। যারা নিয়মিত ট্যাক্স না দিয়ে গোপনে জিনিস-পত্র আমদানি করে ও যারা লুকিয়ে পরের জায়গায় গিয়ে শিকার করে তারা দুজনেই দস্যুর সম-শ্রেণীভুক্ত বলে লোকে মনে করে। তবে একথাও বলা যেতে পারে যে, যে সব লোক মানুষ খুন করে, তাদের সঙ্গে পূর্বোক্ত লোকদের অনেক পার্থক্য। কেউ জঙ্গলে থেকে চুরি করে, শিকার করে, কেউ পাহাড়ে বা সমুদ্রতীরে বাস করে গোপনে জিনিস-পত্র আমদানি করে। এরা যে ভীষণ প্রকৃতির লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই; তাদের কাজই তাদের অসমসাহসিক ও নিষ্ঠুর করে তোলে বটে কিন্তু তাদের কোমল বৃত্তিগুলি একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু শহরবাসী দুর্বৃত্তদের মধ্যে কোমলবৃত্তিগুলি একেবারে লোপ পায়। জাঁ ভালজাঁ দোষী সাব্যস্ত হল। তার অপরাধের শাস্তি সম্বন্ধে আইনের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে ভাল্‌জাঁর পাঁচ বছরের জন্যে কারাদণ্ড হল। সমাজ যখন মানুষকে ত্যাগ করে সেই মুহূর্তে তার যে অনিষ্ট হয়, তার আর কোন সংশোধন নেই।

১৭৯৬ সালের ২২ এপ্রিল একদল কয়েদীর সঙ্গে জাঁ ভাল্‌জাঁকেও হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে তুলোঁ পাঠান হয়। কারাগারের একজন অতিবৃদ্ধ সান্ত্রী ভাল্‌জাঁর যে বর্ণনা দিয়েছিল তা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। সে বলে, ভাল্‌জাঁ উঠোনের উত্তর কোণে

চতুর্থ শ্রেণীর শেষ দিকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ছিল। কয়েদীরা সকলেই মাটির উপর বসে ছিল। ভাল্‌জাঁর অবস্থাটা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। একে লেখাপড়া জানে না, তার উপর দরিদ্র, নিজের অবস্থাটা সম্যক বুঝতে পারছিল না বটে কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যটা যে অত্যধিক সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। যখন তার গলায় লোহার গলাবন্ধ পিঠের দিকে সজোরে হাতুড়ির ঘা দিয়ে এঁটে দেওয়া হচ্ছিল তখন সে কাঁদতে লাগল। তার মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না, শুধু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে চাইল যে, সে ফেবারোলে গাছীর কাজ করত। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ইসারা করে এই বোঝাতে চাইল যে, সে যেন সাতটি শিশুর মাথা স্পর্শ করছে। ও যেন বলতে চায়, ওই সাতটি শিশুর জন্যেই ও যা কিছু অন্যায় করেছে।

ওকে তুলোঁ পাঠান হল। ঘোড়ার গাড়ী করে পৌঁছতে ওদের সাতাইশ দিন লাগল। গলায় লোহার শিকল পরানো। এখানে পোশাক হল লাল রঙের। আগের জীবন থেকে সে যেন ছিটকে পড়ল। এমন কি, তার বাপ-মায়ের দেওয়া নামটা পর্যন্ত মুছে দেওয়া হল। এখন আর ও জাঁ ভাল্‌জাঁ নয়—এখন ও ২৪,৬০১ নম্বর। দিদির কি হল, তার ছেলেগুলিরই বা কি হল, কিছুই ও জানতে পারল না। গাছের গোড়া কেটে ফেললে পাতাগুলির অবস্থা কি হয় তা ত সকলেই জানে।

ওই সাতটি জীবের আর কোন আশ্রয়ই রইল না। তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ী-ঘর তাদের ছাড়তে হল। গ্রাম তাদের ভুলে গেল, বাড়ী-ঘরের কোন চিহ্নই রইল না। বছর কয়েক কারাগারে থাকার পর ভাল্‌জাঁও একদিন তাদের ভুলে গেল। তার মনে যে আঘাত লেগেছিল সেখানকার ঘা শুকোলেও তার দাগ রয়ে গেল। তুলোঁয়

যাওয়ার পর একবার মাত্র সে তার বোনের খবর পেয়েছিল। সে বোধ করি ওর কারাবাসের চতুর্থ বছরে। কেমন করে খবরটা পেয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। তবে ওর চেনা কারুর সঙ্গে বোনের দেখা হয়ে থাকবে। খবর পেল : বোন এখন প্যারিসে। গরীবেরা যে পল্লীতে বাস করে, দিদিও সেই পল্লীতেই আছে। সঙ্গে সর্ব কনিষ্ঠ ছেলেটি। আর ছয়টি ছেলে কোথায় সে খবর পেল না, হয় ত দিদিও জানে না। দিদি এখন একটা ছাপাখানায় কাজ করে। ভোর ছয়টায় কাজে হাজির হতে হয়। শীতের দিনে ছয়টার অনেক পরে সূর্য ওঠে। যে বাড়ীতে ছাপাখানা, সে বাড়ীরই আর এক অংশে একটি পাঠশালা ছিল। শিশুপুত্রকে সেই পাঠশালায় ভরতি করে দেয়। ছেলেটির বয়স এখন পাঁচ বছর। মাকে ভোর ছয়টায় কাজে যেতে হত, আর সাতটার আগে পাঠশালার দরজা খোলা হত না। কাজেই তাকে সে সময়টা উঠোনে বসে থাকতে হত। ছাপাখানার ভিতরে তাকে যেতে দেওয়া হত না। তারা বলত, ছেলে কাছে থাকলে মায়ের কাজের ক্ষতি হবে। লোকজনেরা যখন কাজে যেত তখন দেখতে পেত ছেলেটি বসে বসে ঝিমোচ্ছে। অনেক সময় সে অন্ধকারে জড়সড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। এক বুড়ী পাঠশালার দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে মোতায়েন থাকত। তার থাকবার জন্যে একটি সামান্য চালাঘর নির্দিষ্ট ছিল। বৃষ্টির দিনে বুড়ী ছেলেটিকে নিজের ঘরে তুলে নিয়ে যেত। ঘরে একখানা কোদাল একটি চরকা ও দু'খানি চেয়ার ছিল। ছেলেটি একটা বিড়ালের গা ঘেঁসে শুত, তাতে শীত কম লাগত। সাতটায় পাঠশালার দরজা খোলা হলে সে পাঠশালায় ঢুকত।

যাদের জন্যে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে আজ সে কয়েদ খাটছে তাদের আর কোন খবরই সে পেল না।

চতুর্থ বৎসরের শেষে ভাল্‌জঁা কারাগার থেকে পলায়নের চেষ্টা করে। কারাগারে যা ঘটে থাকে—অর্থাৎ কয়েদীরাই তাকে সাহায্য করল। সে পালাল। দু-দিন সে মাঠে মাঠে পালিয়ে বেড়াল। বলা বাহুল্য, তাকে গ্রেফ্‌তার করবার চেষ্টাও পুরোদমে চলল। প্রতি মুহূর্তে পিছন ফিরে দেখা, সামান্য শব্দে চমকে ওঠা, সব কিছুতেই ভয় পাওয়া, একে যদি স্বাধীনতা বলা যায় তবে ভাল্‌জঁা ওই দুটি দিন স্বাধীন ছিল। এ দুদিন সে যা দেখল, তাতেই তার ভয় হতে লাগল, যদি কোন বাড়ী থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখল, যদি কোন কুকুর ডাকল, যদি কোন ঘোড়া দৌড়ে গেল, যদি ঘণ্টা বাজল, তা হলেই তার ভয় হত যে কেউ হয় ত তার পিছু নিয়েছে। দিনের বেলা তার ভয়, কারণ তখন সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। রাত্রিতে তার ভয়, কারণ তখন কিছুই দেখা যায় না। বড় রাস্তায় তার ভয়, অন্য পথেও তার ভয়। ঝোপ জঙ্গল দেখলেও তার ভয়! ঘুমোতে ভয়। ছত্রিশ ঘণ্টা সে কিছুই খেতে পেল না, ঘুমোতেও পারল না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা সে ধরা পড়ল। পালাবার অপরাধে বিচারে তার আরও তিন বৎসর জেলবাস হল। এমনি ভাবে আরও আট বছর হল। ষষ্ঠ বৎসর ফের পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু চেষ্টা সফল হল না। হাজিরা ডাকার সময় তাকে পাওয়া গেল না, খোঁজা-খুঁজি শুরু হল। রাত্রিতে দেখা গেল, একখানি জাহাজ ছাড়বার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, ভাল্‌জঁা সে জাহাজের তলায় লুকিয়ে আছে। প্রহরীরা তাকে ধরতে গেলে সে বাধা দেয়। ফলে, পলায়ন ও বাধা দেওয়া —এই দুই অপরাধেই সে দোষী সাব্যস্ত হল এবং আরও পাঁচ বছর কারাদণ্ডের আদেশ হল। সঙ্গে সঙ্গে দুবছর তাকে দুটি শিকল পরতে হবে, ফাউ স্বরূপ এ দণ্ড ভোগ করতে হবে। এমনি করে তার দণ্ডকাল বাড়তে বাড়তে তের বছর হল। তের বছরের সময় আবার

শেষবারের মত পলায়নের চেষ্টা করল, এবং চার ঘণ্টার জন্যে তিন বছর ঠুকে দেওয়া হল। এমনি করে তার উনিশ বছর কারাদণ্ড হল। ১৮১৫ সালে অক্টোবর মাসে সে কারামুক্ত হল। একখানি রুটি চুরি করার অপরাধে প্রথম সে কারাগারে প্রবেশ করেছিল ১৭৯৬ সালে।

কারাগারে যখন যায় তখন সে কেঁদেছিল, অজানা ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কেঁপেছিল, কিন্তু উনিশ বছর কয়েদ খেটে যখন কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল তখন সে কিছুই গ্রাহ্য করল না। কারাগারে প্রবেশ করেছিল একটা নৈরাশ্য নিয়ে, আর বের হল একটা বিরক্তি-পূর্ণ বিষণ্ণ ভাব নিয়ে।

জঁা ভাল্‌জঁা লেখাপড়া জানত না বটে কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। মানুষ দুঃখে পড়লে আপনা থেকেই অনেক বিষয় অন্যের চেয়ে ভাল বুঝতে পারে। অভাবে পড়ে সে চুরি করেছিল। কিন্তু ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে তার জ্ঞান তখনও নষ্ট হয়ে যায় নি। কারাগারে থেকেও সময় সময় সে সব কিছু ভেবে দেখেছে, নিজেকে বিচার করেছে। সময় সময় তার মনে হয়েছে যে, দেশের সমাজ-ব্যবস্থাই তার এই সর্বনাশের মূল কারণ। তার মনে হয়েছে, পাঁচ বছর কারাদণ্ডের আদেশ অন্যায়, তারপর পলায়ন চেষ্টার জন্যে বার বার দণ্ড বেড়েছে, তাও অন্যায়। তার কাছে এটা দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। দুর্বল ব্যক্তিবিশেষের উপর সবল সমাজের অত্যাচার ছাড়া একে আর কিছু বলা চলে না। উনিশ বছর ধরে প্রতিদিন এই অত্যাচার, এই অন্যায় তার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। সে খেটে খেতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কাজের অভাবে ভাতডালের ব্যবস্থা করতে পারে নি, এটা সমাজের অসঙ্গত অব্যবস্থারই পরিচয় দেয়। যে সমাজে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, না খেতে

পেয়ে চুরি করলে সাজা দেওয়ার কি অধিকার তার আছে? যে খেতে পরতে দেবে, শাসনের অধিকার ত তারই থাকার কথা।

এ সব প্রশ্ন তার মনে উঠলে তার যে উত্তর তার মনে আসত তাতে তার বিচারে সমাজ দোষী সাব্যস্ত হত। যদি কখনও ছাড়া পায় তা হলে সেও সমাজের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ দেখাতে কসুর করবে না। প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। সে চুরি করে সমাজের যে অনিষ্ট করেছে, দণ্ড দিয়ে সমাজ তার অনেক গুণ বেশী অনিষ্ট করে নি কি? শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে, তার দণ্ড একেবারে অকারণ না হলেও যে নিতান্ত কঠোর, তাতে সন্দেহ নেই। ফলে সমাজের প্রতি তার তীব্র বিদ্বেষ জন্মাল। কারণ, সমাজ তার অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে নি। সমাজ দণ্ডবিধানের সময় যে ক্রোধের মূর্তি ধারণ করে, তারই নাম ন্যায়বিচার। জাঁ ভালজাঁ সমাজের সে নিষ্ঠুর রূপ দেখেছে। তার সংস্রবে যে মানুষই এসেছে সে-ই তাকে আঘাত করেছে, তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। ছেলেবেলায় মা, পরে দিদি তাকে লালন-পালন করেছে, তারপর এ পর্যন্ত আর কেউ তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে নি, একটা মিষ্টি কথাও বলে নি। দুঃখের পর দুঃখের বোঝা বইতে বইতে এই ধারণাটা তার বদ্ধমূল হয়েছে যে, জীবনটা একটা সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে সে পরাজিত হয়ে সব কিছু হারিয়েছে। ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়া তার আর অন্য কোন অস্ত্র ছিল না, তাই কারাগারে যত দিন ছিল তত দিন সেই অস্ত্রেই শাণ দিয়েছে এবং সেই শাণিত অস্ত্র নিয়েই কারাগার থেকে বের হবে ঠিক করল।

জেলখানায় কয়েদীদের লেখাপড়ার জন্যে তুলোঁয় একটি ইস্কুল ছিল, সেখানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। যারা ইচ্ছা করত, তারা ওই ইস্কুলে পড়তে পেত। ভালজাঁর শিখবার আগ্রহ ছিল।

সে যখন ইস্কুলে ভরতি হল তখন তার বয়স চল্লিশ বছর এবং লিখ্‌তে পড়তে ও সামান্য অঙ্ক কষতে শিখল। সে মনে করল, সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে হলে বুদ্ধি খুরধার করতে না পারলে সুবিধা হবে না। তার সব কিছুর জন্যে সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করে সে ভগবানেরও বিচার করতে চাইল এবং তাঁকেও দোষী সাব্যস্ত করে বসল।

যে উনিশ বছর ধরে যন্ত্রণা ভোগ করল, দাসত্ব ভোগ করল, সে সময়টায় একদিকে যেমন কিছুটা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল, অন্য দিকে আবার নাস্তিকতার অন্ধকারে সে ডুবে গেল। তার মন উন্নতও হল, আবার অবনতও হল।

ভাল্‌জাঁর দেহে ছিল অসুরের মত বল। একাই চারজন কয়েদীর কাজ করতে পারত। কথাবার্তা বড় একটা কারুর সঙ্গে কইত না, হাসার প্রশ্ন ত ওঠেই না। অত্যন্ত প্রবল ভাবাবেগে যদি কখনও হাসত ত তা দেখে মনে হত সে হাসি রুদ্ধ ক্রন্দনেরই একটা নতুন রূপ মাত্র। তাকে দেখলেই মনে হত যে, সে যেন সব সময়েই একটা কিছু সাংঘাতিক চিন্তায় ব্যাপৃত আছে।

বছরের পর বছর ধরে তার মনটা নীরস হয়ে গেছে। মন নীরস হলে চোখে জল থাকে না। যখন কারামুক্ত হল তখন উনিশ বছর সে কাঁদে নি।

পাঁচ

গির্জার ঘড়িতে দুটো বাজতেই, সে শব্দেই কি-না বলতে পারিনে, ভাল্‌জাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

তার ঘুম ভাঙার কারণ এও হতে পারে যে, বিছানাটা ওর পক্ষে বড় সুখকর হয়েছিল। দীর্ঘকাল বিছানায় শুতে পায় নি। কাপড় না ছেড়েই শুয়েছিল, তবু বিছানার অত্যধিক আরামে তার ঘুমের ব্যাঘাত হল।

ইতিমধ্যে সে চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। তার ক্লান্তি দূর হয়েছে, কাজেই আর বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে কাটানো তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

চক্ষু মেলে অন্ধকারের মধ্যে সে চারিদিক চেয়ে দেখল। পরে আবার চক্ষু বুজল। তার ইচ্ছা, পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আর তার ঘুম হল না, আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করতে লাগল।

তার মনের অবস্থাটা ঠিক ছিল না। কি যেন একটা গোলমাল পাকিয়ে গেছে। খাবার সময় টেবিলে রূপার বাসন ও ছুরি-কাঁটা দিয়েছিল, সেগুলি তাকে পেয়ে বসল। তার মনে হল, ওই ত ঘরের তাকের উপরেই ত সব সাজানো রয়েছে। কত দূরই বা, হাত কয়েকের বেশি হবে না। শোয়ার ঘরে আসবার সময় বুড়ী ঝিকে সাজিয়ে রাখতে দেখেছিল। বাসনগুলি ওজনে বেশ ভারী এবং পুরোনো, আজকালকার মেকির যুগের তৈরি নয়। বড় গামলাটি বিক্রি করলে গোটা পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যেতে পারে।

আকাশ-পাতাল কত কি সে ভাবল, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারল না। রাত তখন তিনটা বেজে গেছে। বিছানায় উঠে বসে হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা একবার দেখে নিল, সেটা মেঝেয় পড়ে আছে।

এমনি সময় গির্জার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতেই সে যেন জেগে উঠল। তার মনে হল, ওই শব্দ যেন তাকে আহ্বান করছে, বলছে ঃ চলে এসো। সে উঠে দাঁড়াল। ক্ষণেক ইতস্তত করল। তারপর কান পেতে কি শুনল। বাড়ীটা নীরব নিস্তব্ধ। সে তখন আস্তে আস্তে সামনেকার জানলার দিকে এগিয়ে গেল। রাতের আঁধার নিবিড় নয়। চাঁদ উঠেছে। আকাশের এখানে ওখানে মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে। ফলে, কখনও আঁধার কখনও জ্যোৎস্নায় চারদিক ভাসিয়ে দিচ্ছে। চাঁদ কখনও মেঘের আড়ালে লুকোচ্ছে, আবার বাইরে বেরিয়ে এসে হাসছে। ঘরের ভিতর ক্ষীণ চন্দ্রালোক এসে পড়েছে, তাতে ঘরের সব কিছুই অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে। যে ঘুলঘুলি দিয়ে কারাগারে আলোক প্রবেশ করে, তার বাইরে দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে কারাগৃহে যেরকম আলো হয়, এই ঘরেও সেই রকম আলো হচ্ছিল। জানলার কাছে গিয়ে ভাল্‌জাঁ সেটা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। জানলায় গরাদে নেই। জানলার ও-পাশেই বাগান। জানলার কবাট খুলতেই একটা শীতল বাতাস এসে তাকে কাঁপিয়ে তুললে। সঙ্গে সঙ্গেই সে জানলার কবাট ভেজিয়ে দিল। উঁকি মেরে বাগানটা তন্ন তন্ন করে দেখে নিল। বাগানের চারদিক ঘিরে অনুচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর ডিঙানো খুব কঠিন হবে না। দূরে, বাগানের শেষ প্রান্তে সারি সারি গাছ, গাছের সারি ও প্রাচীরের মধ্যে একটি সরু হাঁটাপথ আছে বোঝা গেল।

বাইরেটা দেখে শুনে সে আবার বিছানার কাছে ফিরে এল। ঝোলার ভিতর থেকে কি যেন একটা খুঁজে বার করল। সে বস্তুটা বিছানার উপর রেখে পায়ের জুতো খুলে ঝোলায় রাখল। তারপর ঝোলাটা পিঠের উপর নিয়ে টুপি পরে মুখাবরণটি নামিয়ে দিল। লাঠি-গাছটি নিয়ে জানলার পাশে এনে রেখে পুনরায় বিছানার কাছে ফিরে

এল এবং সেই বস্তুটি হাতে তুলে নিল। বস্তুটি আর কিছুই নয়—একদিক সূচালো একটি লোহার শিক। এর উপযোগিতা কি, অন্ধকারে তা ঠিক করা কঠিন, তবে চাবি খুলতে এর প্রয়োজন হতে পারে। দিনের বেলা দেখলে বোঝা যেত যে খনিতে যারা কাজ করে, এটায় তারা আলো ঝুলিয়ে রাখে। টুলোঁর চার পাশে যে উঁচু পাহাড় আছে, সেখানে পাথর কাটবার জন্যে কয়েদীদের নিযুক্ত করা হত এবং তাদের খনিতে কাজ করবার উপযোগী যন্ত্রপাতি দেওয়া হত। এটিও তাই।

ডান হাতে লোহার শিকটি তুলে নিয়ে, দম বন্ধ করে নিঃশব্দ পায়ে সে বিশপের শয়ন-ঘরের দিকে আগিয়ে গেল।

বিশপ তখন ঘুমে অচেতন, দরজা ভেজান রয়েছে, বন্ধ করা হয় নি। কান পেতে কি শুনল—ঘরের ভিতর টু-শব্দটি পর্যন্ত শোনা গেল না।

বিড়াল যে রকম নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে দরজা ঠেলে ঢুকতে চায়, সে আঙুল দিয়ে তেমনি করে ধীরে কবাট ঠেলল।

কবাট নিঃশব্দে সরতে লাগল। কবাট এতটুকু ফাঁক হল যাতে সে ঢুকতে পারে কিন্তু মুশকিল হল এই যে, দরজার প্রায় মুখেই একটি ছোট্ট টেবিল এমনি ভাবে রয়েছে যে, কবাট যতটা ফাঁক হয়েছে তাতে ঘরের ভিতর ঢোকা যায় না।

অসুবিধাটা তার বুঝতে দেরি হল না। কবাট আরও একটু ফাঁক করা দরকার, নইলে উপায় নেই।

এবারে সে আরও একটু জোরে কবাটে ঠেলা মারল। এবার কবাট সরবার সময় মরচে-পড়া কব্জা থেকে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হয়ে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। ভাল্‌জাঁ চম্‌কে উঠল, ভয়ে তার বুক তখন দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার মনে হল, কব্জার শব্দে বৃদ্ধ বিশপ ও বাড়ীর সকলে জেগে

উঠবে, হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। লোকজন সব দৌড়ে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে শহরের সকলে জেগে উঠবে। পুলিশ আসবে। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল, সর্বনাশের আর দেরি নেই।

ভাল্‌জাঁ পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। নড়াচড়ার সাহস হল না। এমনি ভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। এখন দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গেছে। ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল। কই, কেউ ত নড়াচড়া করছে না। কান পেতে শুনল, সেই ঘরের মধ্যেও কারুর সাড়াশব্দ নেই। তা হলে মরচে-ধরা দরজা খোলার শব্দে কেউ জাগে নি।

প্রথম বিপদ কেটে গেছে, কিন্তু ওর মন থেকে ভীষণ ভয় তখনও নিঃশেষে দূর হয় নি। তবু সে পিছন ফিরল না। যখন সে ভেবেছিল যে তার সর্বনাশ হয়েছে তখনও সে পিছন হটে নি। কেমন করে তাড়াতাড়ি কাজ ফতে করবে, এটাই তার এখন একমাত্র ভাবনা। এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ঘরের আলো-আঁধারির মধ্যে কোথায় কি জিনিস আছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। অবশ্য দিনের বেলা হলে নিশ্চয় দেখা যেত। টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজ ছড়ানো রয়েছে এক পাশে খানকয়েক মোটা বই। এক কোণে একটি টুলের উপর একটা বইয়ের স্তূপ। একখানি চেয়ারে কতকগুলি কাপড়-জামা, সম্ভবত ধোবার বাড়ী থেকে এসেছে, তুলে রাখা হয় নি।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গেল। বিছানার একেবারে কাছে এসে পড়েছে। অত শীঘ্র যে ও সেখানে পৌঁছুবে, এটা ভাবে নি। ঘরের এখানে সেখানে চেয়ার, টিপয়, ফুলদানি ইত্যাদি গুছিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ভাল্‌জা খুব সাবধানে বাসনের তাকের সামনে গিয়ে হাজির হল। অপর পাশে খাটের উপর বিশপ গভীর ঘুমে মগ্ন, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস

সমান তালে উঠছে পড়ছে। খানিকক্ষণ আগে আকাশটা একখণ্ড মেঘে ঢাকা পড়েছিল, হঠাৎ মেঘ কেটে যেতেই ঘর আলোকিত হল। নিষ্পাপ নির্ভীক বিশপ শিশুর মত নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর মুখের স্বাভাবিক হাসিটি তখনও মিলিয়ে যায় নি। যে আলোকে তাঁর মন পূর্ণ ছিল তা যেন তাঁর দু গাল বেয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ভালজঁা একবার সে দিকে তাকিয়েই সে মুখের পানে আর তাকাতে পারল না, মুখ ফিরিয়ে নিল। সে মুখে উদ্বেগের কণামাত্র ছিল না। তা দেখে ভাল্‌জঁার ভয় হল। দুষ্ট দুষ্কার্য করতে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে ওই শান্ত সমাহিত নিদ্রামগ্ন বৃদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, সংসারে এর চেয়ে মহত্তর কিছু দেখতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহের বিষয়।

তার মত এক দুষ্টের অত কাছে শুভ্র কেশ বৃদ্ধ একাকী শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন, এ রকম দৃশ্যের যে তাৎপর্য তা সে স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও ওর অন্তরকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। শুধু এই মাত্র বলা যেতে পারে যে, এ দৃশ্য ওর হৃদয়কে অতি মাত্রায় স্পর্শ করেছে, ও চমকিত হয়ে উঠল। কি করবে স্থির করতে পারছিল না। সে কি নিজের সর্বনাশ করবে, না, নিজেকে রক্ষা করবে? তার মন দুলতে লাগল। বৃদ্ধকে হত্যা করবে, না, তাঁর পায়ের তলায় আছড়ে পড়বে?

মিনিট কয়েক ভেবে নিয়ে বাঁ হাতে মাথার টুপি খুলে ফেলল। ডান হাতে তখনও সেই লোহার শিকটি। চুল্লীর উপর ক্রুশাবদ্ধ যীশুর মূর্তি চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হল, সেই মূর্তি যেন হাত বাড়িয়ে একজনকে আশীর্বাদ আর একজনের অপরাধ মার্জনা করছেন।

হঠাৎ ভাল্‌জঁা মাথায় টুপি পরল। আর সে বিশপের দিকে তাকাল না। তাড়াতাড়ি তাকের কাছে গিয়ে পৌঁছল। তাকের ডালা খুলবার জন্যে লোহার শিকটির প্রয়োজন হল না, তাতে

চাবি লাগানোই ছিল। তাক খুলে দেখল রূপার বাসনগুলি পাঁজা করে রাখা আছে। ক্ষিপ্র হস্তে বাসনের পাঁজা তুলে নিয়ে জোর পায়ে ঘরের বাইরে চলে এল। এবং যে ঘরে শুয়ে ছিল সেখানে গেল। জানলা খুলল, লাঠিগাছটি নিল, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাসনগুলি নিজের ঝোলার মধ্যে পুরল! পরে বাগান পার হয়ে লাফ দিয়ে প্রাচীর ডিঙিয়ে অবিলম্বে পলায়ন করল।

* * * * *

পর দিন প্রাতে সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে উঠে বিশপ বাগানে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে বুড়ি ঝি ছুটে এসে বলে উঠল, 'হুজুর, হুজুর, তাকের উপর বাসনের চুপড়িটা ত দেখতে পাচ্চি নে! রাতে আপনার সামনেই ত সেগুলি ধুয়ে মুছে পাঁজা করে চুপড়ির ভিতর তাকের উপর রেখেছিলাম—যেমন রোজ রাখি।'

বিশপ জবাবে বললেন, 'জানি।'

ঝি বললে, 'বাঁচলাম! আমার নিজের মনকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।' এমন সময় বিশপ ভালজাঁ যে ঘরে শুয়েছিল সে ঘরের জানলার কাছে একটি ফুল গাছের গোড়া থেকে বাসন-রাখা চুপড়িটি কুড়িয়ে নিয়ে ঝির হাতে দিয়ে বললেন, 'এই যে সেটা, নাও।'

ঝি বলল, 'কিন্তু বাসনগুলি কোথায়?'

'আমি ত তা জানি নে।'

ঝি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তা হলে কি সব চুরি গেল? হুঁ, ঠিক হয়েছে, কালকের সেই লোকটাই চুরি করে পালিয়েছে। কি বিশ্বাসঘাতক! দেখি লোকটা আছে, না, চলে গেছে।'

বলতে বলতে ছুটে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে প্রার্থনা-ঘরের যে জানলা

দিয়ে চোর পালিয়েছে সেই জানলার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, সেই লোকটাই নিয়ে পালিয়েছে! ওমা, এখন কি হবে! এত করে খাওয়ান হল, আদর করে ভাল বিছানায় শুতে দেওয়া হল, সে-ই কি-না এই সর্বনাশ করলে গা! ওর নরকেও জায়গা হবে না।'

বিশপ তখন হেঁট হয়ে যে গাছটির উপর চুপড়িটা পড়েছিল সেটা দেখছিলেন। গাছটা ভেঙে গেছে দেখে তিনি একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। চেঁচামিচি শুনে মুখ তুলে তাকালেন। তিনি চুপ করেই ছিলেন, একটিও কথা বললেন না।

বুড়ী আঙুল বাড়িয়ে দেখাল লোকটা কেমন করে লাফিয়ে ওই দিকের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। তার পদচিহ্ন রয়ে গেছে। সে বললে, 'লোকটা কি বদমাশ! সব বাসন নিয়ে গেল!'

বিশপ মুহূর্ত নীরব থেকে পরে বুড়ীর সামনে এসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যে অত করে বলছ, তা ও বাসনগুলি কি সত্যি আমাদের? আমরা সন্নেসী, নিজের বলতে আমাদের কিছু থাকতে নেই। যা আমার নয়, তা এতদিন আমার বলে ধরে রেখেছিলাম মাত্র। আজ যদি তা নিয়েই গিয়ে থাকে ত বেশ ভালই করেছে, আমাকে অন্যের জিনিস আগলাবার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। লোকটি আমার হিতৈষী বটে।'

ঝি মুনিবের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

তখন বিশপ বললেন, 'এ সব দামী জিনিস সবই গরীবদের। যারা খেতে পায় না তাদের। যে নিয়েছে সে-ও গরীব। কাজেই তার জন্যে আমার দুঃখ করা উচিত নয়।'

বিশপের কথাটা বুড়ীর কাছে ভাল লাগল না। সে মনের ভাব গোপন রেখে পুনরায় বলল, 'আমি আমাদের জন্যে ভাবি নে। কিন্তু

আপনার জন্তেই ভাবনা। আজ খাবেন কেমন করে? কাঁটা-চামচ পর্যন্ত নিয়ে গেছে।'

বিস্মিত হয়ে বিশপ তার দিকে চেয়ে রইলেন, পরে বললেন, 'কেন, দস্তার কাঁটা-চামচ ত আছে, তাই দিয়ে চলবে।'

বুড়ী ঘাড় নেড়ে বলল, 'দস্তায় একটা বিশ্রী গন্ধ আসে।'

'তবে লোহার কাঁটা-চামচ।'

বুড়ী মুখভঙ্গী করে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে বলল, 'কিন্তু লোহার পাত্রে খাদ্য বিস্বাদ লাগবে।'

বিশপ বললেন, 'বেশ। তবে কাঠের বাসন ব্যবহার করব।'

কিছুক্ষণ পরে আগের রাত্রে যে টেবিলে জাঁ ভাল্‌জাঁর সঙ্গে বসে খেয়ে ছিলেন, সেই টেবিলে বিশপ খেতে বসলেন। খেতে খেতে প্রফুল্লচিত্তে বোনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সত্য বলতে কি, এক টুকরা রুটি দুধে ডুবিয়ে নিতে কাঠের তৈরি কাঁটা চামচেরও প্রয়োজন হয় না।'

বোন জবাবে কিছু বললেন না। বুড়ী রাগে ফুলতে লাগল। পরে বলল, 'তা যা ভাল বোঝেন করুন, আমার কিন্তু ভাল লাগে না। নিরাশ্রয় গরীব জেনে আশ্রয় দেওয়ার ফল যদি এ-ই হয় ত লোকে আর কাউকে কখনও আশ্রয় দিতে চাইবে না।' পরে সে আবার বলল, 'বেশ কাণ্ড! ভাগ্যে কেবল চুরিই করেছে, আরও যা করতে পারত, ভাবলে বুক কেঁপে ওঠে।'

দাদা বা বোন কেউ কথার জবাব দিলেন না। কাজেই উৎসাহ না পেয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে বুড়ী নিজের কাজে চলে গেল। তাঁরা উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

বিশপ বলে উঠলেন, 'কে?—ভিতরে আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গেই ভেজানো দরজা ঠেলে জুতার মচ্‌ মচ্‌ শব্দ করতে করতে তিনজন পাহারাওআলা সঙ্গে নিয়ে একজন দারোগা এসে উপস্থিত

হল। তাদের সঙ্গে হাত-কড়ি অবস্থায় যে লোকটি এল সে জাঁ ভাল্‌জাঁ। জমাদার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা ঘরে ঢুকেই মাথার টুপি খুলে বিশপকে নমস্কার করল।

বিশপ তাকে আশীর্বাদ করে তার অনুচরদের পানে তাকাতেই বন্দী ভালজাঁকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি তার সামনে গিয়ে বল্‌লেন, 'এই যে, তুমি এসেছ? তোমাকে দেখে খুশি হলাম। কিন্তু কি হয়েছে? তোমাকে বাতিদান দুটিও দিয়ে ছিলাম। ও দুটিও রূপার তৈরি, দাম কম পক্ষে একশ টাকারও বেশি হবে। তোমার কাঁটা চামচ বাসনের সঙ্গে সে দুটি নাও নি কেন? দেখা হয়ে ভালই হল, এ দুটো নিয়ে যাও।'

ভাল্‌জাঁ একবার বিশপের দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইল যে, তা বর্ণনা করার মত শক্তি জগতের কোন ভাষায় কোন ব্যক্তির আজ পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু পরক্ষণেই সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা বিশপকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তা হলে, ও যা বলেছে তা সত্যি?—আপনিই ওকে বাসনগুলি দিয়েছেন? আমরা কিন্তু চুরি সন্দেহে ওকে গ্রেফ্‌তার করেছি।'

মৃদু হেসে বিশপ বললেন, 'উনি কি বলেছেন যে একজন বিশপের বাড়ী উনি রাত্রিবাস করেছিলেন, সেই বিশপই ওকে এসব দিয়েছেন! বেশ, বেশ! এর জন্যে কষ্ট দিয়ে ওকে ধরে এনে মহাভুল করেছ!'

দারোগা তখন বললে, 'তা হলে কি ওকে ছেড়ে দেব?'

বিশপ বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! তা কি একবার করে বলতে! এখুনি ছেড়ে দাও!'

দারোগার ইঙ্গিতে পাহারাওআলারা তৎক্ষণাৎ ভাল্‌জাঁর হাতকড়ি খুলে দিল।

সে একটু পিছিয়ে গেল। বিড়্‌বিড়্‌ করে নিদ্রাবিষ্টের মত সে বলল, 'তা হলে সত্যি কি আমি ছাড়া পেলাম?'

একজন পাহারাওআলা জবাবে বললে, 'হাঁ। তুমি কি তা বুঝতে পারনি?'

বিশপ তখন ভাল্‌জাঁকে বললেন, 'বন্ধু, যাবার আগে তোমার বাতিদান দুটি নিতে ভুল করো না।'

এই বলে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে বাতিদান দুটি এনে তার সামনে ধরে দিলেন।

অদূরে বিশপের বোন ও ঝি বুড়োর কাণ্ডকারখানা নীরবে দেখতে লাগলেন।

ভাল্‌জাঁ পাথরের মূর্তির মত তার পানে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়ল। যন্ত্র-চালিতের মত হাত বাড়িয়ে বাতিদান দুটি কুড়িয়ে নিল।

তখন বিশপ তাঁকে বললেন, 'এবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও। আর এক কথা, যদি কখনও এ বাড়ীতে আসার প্রয়োজন হয় ত বাগান ঘুরে যাওয়ার কোনই দরকার নেই। আমার দরজা সব সময়ই খোলা থাকবে।'

তারপর দারোগার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন যেতে পার।'

জাঁ ভাল্‌জাঁর চেতনা লোপ পাওয়ার মত হল, সে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, তার মনে হচ্ছিল, বুঝি-বা সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

বিশপ তার কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'জাঁ ভাল্‌জাঁ, ভাই আমার, এখন থেকে তুমি আর শয়তানের ক্রীতদাস নও, তুমি ভগবানের। শয়তানের কাছ থেকে তোমার আত্মাকে আমি কিনে ভগবানের পায়ে অর্পণ করে দিয়েছি। এই অর্থের সাহায্যে তুমি সৎভাবে জীবন-যাপনের চেষ্টা করবে, আমাকে কথা দিয়েছ। একথা যেন কখনও ভুলে যেয়ো না।'

ছয়

জাঁ ভাল্‌জাঁ ঊর্ধ্বশ্বাসে শহর পরিত্যাগ করে গেল। যেমন করে হোক, যত শীঘ্র সম্ভব সে খোলা মাঠে এসে হাঁফ্‌ ছেড়ে, বাঁচতে চায়। শহরে যেন তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কোন্‌ পথে গেলে সে তার ঈপ্সিত স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে তা তার জানা ছিল না। সুমুখে যে রাস্তা পায় সেই রাস্তা ধরেই সে এগিয়ে চলল। সারা সকালটা সে এমনি করে ঘুরে মরল। সকাল থেকে একটি দানাও তার পেটে পড়ে নি, খাবার ইচ্ছাটাও যেন তার উবে গেছে, মনের ভিতর কত ভাবই না আসছিল। এ তার কি হল?—জয়? না, পরাজয়? তার ভিতরকার সত্যিকারের যে মানুষটি বিশ বছরের অবিচারে কুবিচারে অত্যাচারে জীবন্মৃত হয়েছিল, সময় সময় সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। এক একবার তার মনে হচ্ছিল, এর চাইতে কারাগারও ছিল ঢের ভাল, আরামের। অন্যায় করলে সান্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেয় বটে, কিন্তু নিয়মিত খাওয়া, শোয়া, খাটুনি—সব নিয়মে বাঁধা।

এখানে সেখানে দু-একটি মরসুমি ফুল তখনও রয়েছে, তাদের গন্ধে ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল! ছেলেবেলার কথা ও যেন সহ্য করতে পারছিল না।

সরা দিন পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল। কত কথাই না ওর মনে হল। ওর সেই প্রথম অপরাধ, পেটের দায়ে (তাও নিজের জন্যে নয়, সাত সাতটি অনাথ শিশুর জন্যে) এক টুকরো রুটি চুরি, সেই সামান্য অপরাধে কঠোর শাস্তি—উনিশ বছর জেলখানায় বাস! কারাগারের সেই অকথ্য অত্যাচার; দুঃখে কষ্টে অত্যাচার-অবিচারে

সে ভগবানের অস্তিত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস হারাল, মানুষের মনুষ্যত্বে পর্যন্ত তার অবিশ্বাস জন্মাল। তারপর বিশপের এই দয়া, এই করুণা,— একে একে সব কথা ওর মনে পড়ে ওকে ব্যাকুল করে তুলল।

সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়, ঘুরতে ঘুরতে এক তেপান্তরের মাঠে এসে সে উপস্থিত হয়ে একটা উঁচু ঢিবির উপর শ্রান্তক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। যত দূর দৃষ্টি যায়, তার মধ্যে কোন দিকেই লোকজনের বসতি নেই।

অদূরে কে একজন আপন মনে গান গাইতে গাইতে আসছিল। মাথা তুলে ভাল্‌জাঁ দেখলে একটি বালক আসছে, হাতে তার বেহালার মত কি একটা বাদ্যযন্ত্র, পিঠে একটা বাক্স ঝুলান। এই বালক গ্রাম থেকে গ্রামে গান গেয়ে নানা রকম তামাশা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে, এই তার পেশা।

ছেলেটা ভাল্‌জাঁকে দেখতে পায়নি, ঝোপের ও-পাশে এসে বিশ্রাম করতে লাগল। বসে বসে তার ভাল লাগছিল না। কি মনে করে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে সে তুড়ি মেরে সেটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে খেলা করতে লাগল। একবার আধুলিটা গড়িয়ে এসে ভাল্‌জাঁর পায়ের কাছে পড়ল।

জাঁ ভাল্‌জাঁ তার পা ওই আধুলিটির উপর রাখল।

আধুলিটি কোন্‌ দিকে যায়, ছেলেটি সে দিকে নজর রেখেছিল এবং ভাল্‌জাঁ যে পায়ে চেপে রাখল তাও তার নজর এড়াল না। সে সোজা তার কাছে এসে দাঁড়াল।

জায়গাটা তেপান্তরের মাঠ তা পূর্বেই বলা হয়েছে, সামনাসামনি কোন লোকালয় ত দূরের কথা, পথচলতি লোকজনের সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই। দূরে আকাশে একদল পাখী উড়ে যাচ্ছে, তাদের অস্ফুট

ধ্বনি মাত্র শোনা যাচ্ছে। বালক সূর্যের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সূর্যালোকে ছেলেটির মাথার চুল সোনার মত দেখাচ্ছে। জঁা ভালজঁার মুখখানিও আরক্তিম।

ছেলেটির মানুষের চরিত্র সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না, তাই সরল ভাবে সোজা ভাল্‌জঁার সামনে এসে বলল, 'মশাই, আমার আধুলিটি?'

জঁা ভাল্‌জঁা তাকে শুধাল, 'নাম কি তোর?'

'আমার নাম জেয়রভে।'

ভাল্‌জঁা বলল, 'ভাগ্‌ এখান থেকে—যদি ভাল চাস, নইলে—'

বালকটি বলল, 'যাচ্ছি, কিন্তু দয়া করে আমার আধুলিটি দিন।'

ভাল্‌জঁা মাথা নীচু করল, কিছু বলল না।

বালক পুনরায় বলল, 'মশাই, দিন না আমার আধুলিটা।'

ভাল্‌জঁার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ।

ছেলেটা কাঁদতে শুরু করল, 'আমার আধুলি দিন, আমার আধুলি—'

ভাল্‌জঁা যেন শুনতেই পেল না। বালক তার জামা ধরে টানতে লাগল। ভাল্‌জঁার যে-পায়ের তলায় আধুলিটি ঢাকা পড়েছে, সেটি সরাবার চেষ্টা করল; বলল, 'পা-টা একটু সরান, আমার আধুলিটা নেবো।'

বালকের কান্নায় ভাল্‌জঁা মাথা তুলে তার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইল। তার চোখে মুখে রাগের লক্ষণ। বালকের সাহস দেখে সে বিস্মিত হল। লাঠির দিকে হাত বাড়াল এবং চীৎকার করে উঠল, 'কে তুই?'

বালক বলল, 'আমি জেয়রভে। আমার আধুলিটি দিন। পা-খানা একটু সরান।'

ছেলেটা বয়সে বালক হলেও বিরক্তির সঙ্গে তখন ভাল্‌জঁাকে যেন

ভয় দেখিয়েই বলে উঠল, 'তুমি পা সরাবে কি না—পা সরাও বলছি, নইলে মজা দেখাব।'

ভাল্‌জাঁ তার দিকে চেয়ে বলল, 'সে কি, তুই এখনও এখানে রয়েছিস?' হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু আধুলিটি পায়ে চেপেই দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'তুই যাবি? না?'

জেয়রভে সভয়ে তার দিকে তাকাল। এবং কাঁপতে কাঁপতে তখুনি ছুটতে লাগল। ভয়ে সে কালো ফ্যাকাশে মেরে গেছে, চেঁচাবার বা কাঁদবার শক্তিও তার লোপ পেয়ে গেছে। সে যে কোথায় কোন্ দিকে ছুটেছে তার কিছুমাত্র খেয়াল নেই। এক দৌড়ে অনেকটা দূরে এসে দম নেবার জন্যে তাকে থামতে হল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে কোথায় সে অন্তর্ধান করল।

সূর্য তখন অস্ত গেছে, চারি দিক আঁধার হয়ে আসছে। সারা দিন পেটে কিছু পড়ে নি, রোদে রোদে পাগলের মত ঘুরে ভাল্‌জাঁর একটু জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছে। একই অবস্থায় খানিকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, একবারও নড়ল না, বা চোখ ফেরাল না —তার দৃষ্টি যেন অদূরের একটা ভাঙা কলসীর দিকেই একান্তভাবে বদ্ধ হয়ে আছে! মাঝে মাঝে জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। সহসা সে চমকে উঠল, মাঠের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শীত বোধ হচ্ছে। মাথার টুপিটা ঠিক করে পরে জামার বোতাম এঁটে ঝুঁকে পড়ে লাঠি গাছটি তুলে নিতে গেল।

হঠাৎ পায়ের কাছে একটি চকচকে আধুলি দেখতে পেল। পায়ের চাপে সেটি ঘাসের মধ্যে অনেকটা মিশে গেছল। আধুলিটার দিকে নজর পড়তেই সে আপন মনে বলে উঠল, 'ওটা কি?'

তিন-পা পিছন হটে এসে সে ফিরে দাঁড়াল। যেখানটায় তার পা ছিল সে দিক থেকে সে তার দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। চকচকে

আধুলিটা যেন এখন ছাড়া পেয়ে তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে কি ভেবে সে এগিয়ে গেল এবং কম্পিতহস্তে আধুলিটি তুলে চারিদিক তাকাতে লাগল।

কিছুই সে দেখতে পেল না। রাত ঘনিয়ে আসছে, মাঠে শীত জমে আসছে, চারিদিক কুয়াশায় ঢেকে গেছে। একটা দিক লক্ষ্য করে হন্ হন্ করে সে এগিয়ে যেতে শুরু করল, ওই দিকেই ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে। ষাট-সত্তর হাত গিয়ে সামনের দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। তারপর যত জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'জেয়রভে!' জেয়রভে!'

তখুনি আবার চুপ করে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেল না। লোকজন কেউ কোথাও নেই, কিছু নেই। অমন অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না, অমন নীরবতায় মানুষের সাড়া হারিয়ে যায়। বাতাসের সঙ্গে কন্‌কনে শীত এসে তাকে পাগল করে দিল। চারিদিকেই যেন একটা বিপদের রাজত্ব—ছোট ছোট গাছপালাগুলি যেন তাকে ভয় দেখাচ্ছে।

আবার সে হাঁটতে শুরু করে দিল। জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে সে থামল এবং চীৎকার করে ডাকতে লাগল, 'জেয়রভে! ও জেয়রভে!' তার ডাকে একটা ব্যাকুলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। বালক তার ডাক শুনলেও হয় ত ভয়ে সাড়া দিত না। আর ইতিমধ্যে সে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে নিশ্চয়।

এর মধ্যে ভাল্‌জাঁর সঙ্গে এক পুরোহিতের দেখা হল। তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। ভাল্‌জাঁ তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, দেখুন, এ পথে একটি বছর দশেকের ছেলেকে যেতে দেখেছেন?'

'না ত।'

'ছেলেটির নাম জেয়রভে।'

'তা হবে, কিন্তু আমি ত কই কাউকে দেখি নি পথে।'

ভাল্‌জাঁ তার পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার গরীবদের দেবেন। ছেলেটির বয়স দশ বছর হবে, পিঠে একটা কাঠের বক্স, হাতে বেহালার মত একটা তারের বাদ্যযন্ত্র।'

'না, আমি এরকম কাউকে দেখি নি।

'আচ্ছা, কাছাকাছি কোন গ্রামে জেয়রভে নামে কেউ থাকে জানেন ?'

'আমার মনে হয়, তুমি যার কথা বলছ, সে এখানকার বাসিন্দা নয়। পথ-চলতি কেউ হবে। এ পথে অনেকেই ও রকম আসা-যাওয়া করে কি-না।"

হঠাৎ ভাল্‌জাঁ পকেটের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে আরও দুটি টাকা বের করে পুরোহিত মহাশয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার গরীবদের জন্যে।'

পরক্ষণেই আবার পাগলের মত বলে উঠল, 'পুরোহিত মশাই, আমাকে গ্রেফ্‌তার করুন, আমি চোর, ডাকাত !'

পুরোহিত মহাশয় পাগলের সঙ্গে বাক্যালাপ করে মাঠের মাঝে সময় নষ্ট করতে চান না, ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে তাকে ছুটিয়ে দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জাঁ ভাল্‌জাঁও যেদিকে প্রথম যাচ্ছিল সেই দিকেই ছুটতে লাগল। অনেক দূর এগিয়ে গেল, চারিদিকে তার দৃষ্টি। সে চীৎকার করে বালককে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছিল। কিন্তু আর কারুর সঙ্গেই তার দেখা হল না। ছোট ছোট গাছপালা দেখে ভুল করে সে দু-তিনবার ছুটে গিয়েছে ; কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে পথ ধরেছে।

তারপর সে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে তিনটা বড় রাস্তার মোড়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আর একবার সে বালকের নাম ধরে ডেকে উঠল। কুয়াশায় তার স্বর মিলিয়ে গেল, প্রতিধ্বনিও হল না। সে পুনরায় ধীরে ধীরে অস্পষ্ট জড়িত স্বরে ডাকল, 'জেয়র্‌ভে!'

আর সে সইতে পারে না। পা দুখানা আর তার দেহকে বহন করতে পারছিল না, হাঁটু দুটো অবশ হয়ে এসেছে। একখানা বড় পাথরের উপর সে বসে পড়ল। অনুতাপে, দুঃখে, অভিমানে সে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল, আর আপন মনেই বলে উঠল, 'আমি একটা শয়তান, একটা আস্ত বদমাশ!' তারপর সে কি কান্না! উনিশ বছরের রুদ্ধ কান্নায় সে ফেটে পড়ল।

* *

জাঁ ভাল্‌জাঁ যখন বিশপের বাড়ী থেকে একদম মুক্তি পেল তখন তার মনের যে ভাব ছিল, এখন আর সে ভাবটি তার মনের কোণেও খুঁজে পেল না, এবং তার মানসিক অবস্থার এ পরিবর্তনের কোন কারণই সে বুঝতে পারল না। বিশপ তার প্রতি যে অসীম করুণা দেখিয়ে তার মন গলিয়েছিলেন, সহসা না জানি কেন সে তার সে মনকে শক্ত করল। বুড়োর কথাগুলি তার মনে পড়ল: 'এর পর থেকে তুমি সাধুর জীবন যাপন করবে—আমাকে কথা দিয়েছ। আমি শয়তানের কাছ থেকে তোমার হৃদয় কিনে নিয়ে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করেছি।' কথাটা বার বার তার মনে হতে লাগল। পাপ করেও ভগবানের করুণা পেলে পাপীর মনে একটা অহঙ্কার জন্মানো স্বাভাবিক এবং সেই অহঙ্কার থেকেই সে নিত্য নতুন পাপ কাজ করবার প্রেরণা পায়। তাই বিশপের সে করুণার কথা মনে হতেই তার অন্তর বিদ্রোহ করে বসে। তার মনে হয়, বিশপ তাকে মার্জনা করে যে করুণা

দেখালেন তার মত আঘাত সে জীবনে কখনও পায়নি। সুতরাং তাঁর করুণা, দয়া, দাক্ষিণ্যকে সে যতই অস্বীকার করতে পারবে ততই তার অন্তর শক্ত থাকবে। যদি সে তা না করে, কোন সময় স্বীকার করে বসে তা হলে এত দিন মানুষের অবিচার কুবিচার অন্যায় সহ্য করে মানুষ জাতির প্রতি তার যে একটা বিদ্বেষভাব পালন করে সে তৃপ্তি পেয়েছে তা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। এবার হয় সে বিজয়ী হবে, নয় ত চির-জীবনের মত কতুর বনে যাবে। এমনিতর নানা বিরুদ্ধ ভাব এসে তার অন্তরে একটা দেবাসুরের লড়াই বাধিয়ে দিল।

এমনি করে ভাল-মন্দ ভাবতে ভাবতে সে মাতালের মত পথ চলতে লাগল। এ শহর থেকে যে কাণ্ডটা করে সে চলেছে, ফলে তার জীবনে কি পরিবর্তন আসবে সে সম্পর্কে তার মনে আবছা কোন ধারণাও কি ছিল? মানুষের জীবনের এক একটা সময়ে মনে যে ভাল-মন্দর প্রেরণা আসে তা কি তার জীবনেও আসবে? এবারে যদি নিজেকে সে সংশোধন করতে চেষ্টা করে, তবে সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ মানুষ হবার সৌভাগ্য লাভ করবে। আবার যদি বিপথে পা চালিয়ে দেয়, তা হলে এমন নীচে গিয়ে নামবে যে আর উঠবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। হয় তাকে চরিত্রের বলে মুক্তিদাতা বিশপের চাইতে বড় হতে হবে, নতুবা পৃথিবীর সব চেয়ে নীচ জীবে পরিণত হয়ে বাঁচতে হবে। সে যদি ভাল হতে চায়, সৎ হতে চায়, তা হলে দেবতা হতে পারে। আর যদি শয়তান হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে তা হলে তার পথও খোলা।

ভবিষ্যৎ জীবনের পবিত্র শান্তির জন্যে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল এবং কেমন করে কি রকমে সে পথ চলবে, তাই তার একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

একটা ব্যাপার নিজেও ঠিকমত বুঝতে পেরেছে যে, সে আর ঠিক

আগেকার মানুষটি নেই, তার মনের অনেক অদল-বদল হয়ে গেছে। বিশপের প্রভাব থেকে তার আর এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই, শক্তিও নেই। এ সত্য আজ সে জলের মতই স্পষ্ট বুঝতে পারছে।

মনের ভাব যখন তার এরকম, ঠিক সেই মুহূর্তে বালক জেয়রভের সঙ্গে তার দেখা এবং কেমন করে বালকের আধুলিটি সে আত্মসাৎ করেছে তা আগেই বলা হয়েছে। এ কাজ কেন সে করল, তার নিশ্চয় কোন কারণই সে বাতলাতে পারবে না। সুদীর্ঘ উনিশ বছর কয়েদ খেটে আসার পর এই প্রবৃত্তিটিই কি সে আয়ত্ত করে নিয়ে এল? আমরা কিন্তু তা বলতে পারব না। বড় জোর বলতে পারি যে, সে এ কাজ করে নি, করেছে তার ভিতর যে একটা পশু আছে, শয়তান আছে, যে এতদিন বাসা বেঁধেছিল তার ভিতর—এ কাজ তারই। নতুবা সে তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল।

কারণ যা-ই থাকুক, তার মনুষ্যত্ব তখন পশুশক্তির কাছে হার মেনেছে। আবার যখন তার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এল, তখন সে কৃতকার্যের জন্যে অনুতপ্ত হল, ভয়ে ভাবনায় মুষড়ে পড়ল। চুরি করবার ক্ষমতা আর তখন তার নেই, সে শক্তি তার চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে গেছে; ছেলেটার আধুলিটা আত্মসাৎ করা থেকেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

অন্যায়ের প্রতি তার একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা দেখা দিল। এবং সেটা এমনি করেই এল যে, তাকে এড়াবার আর কোন দিক দিয়েই এতটুকুও ফাঁক রইল না। সে প্রাণপণে ছেলেটাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তাকে খুঁজে পেলে আধুলিটি ত তাকে দেবেই, অধিকন্তু ক্ষতিপূরণও করবে। এবং বহু চেষ্টা করেও যখন তার কোন সন্ধানই মিলল না, তখন হতাশ হয়ে সে মাটিতে বসে পড়ল। তখনও তার ঝোলার মধ্যে

বিশপের বাড়ীর চোরাই বাসনগুলি রয়েছে—মনে তার কত বিচিত্র ভাবের আনাগোনা চলতে লাগল।

তার সামনে একবার জাঁ ভাল্‌জাঁ তার কদর্যতা নিয়ে এসে উপস্থিত হল। একে দেখে সে ভয়ে আঁতকে উঠল। সে আর চোখ মেলে তাকাতে পারল না—দু হাতে চোখ ঢেকে রইল। পরক্ষণেই আবার যাকে দূরে—অতিদূরে মশালের আলো বলে এগিয়ে যাচ্ছিল, এখন দেখতে পেল সে মশাল নয়, আলোর একটি ক্ষীণ শিখা মাত্র। এবং সে আলোর শিখার দিকে ভাল করে চাইতেই সে বুঝতে পারল, সে শিখা আর কিছুই নয়—সে স্বয়ং বিশপ।

দেখতে দেখতে সে শিখা বিরাট মশালের মত জ্বলে উঠে গভীর অন্ধকারে তাকে যেন পথ দেখাতে লাগল।

তার সম্মুখে তখন দুটি লোক,—এক বিশপ, আর একটি ভাল্‌জাঁ।

এমনি করে তার অন্তর মথিত হতে লাগল এবং যতই সে বিশপের কথা ভাবতে লাগল ততই তিনি তার চোখে আরো মহত্তর হয়ে উঠতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ভাল্‌জাঁ দূরে—অতি দূরে সরে যেতে লাগল এবং অবিলম্বে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত তার মন থেকে মুছে গেল। অবশেষে ভাল্‌জাঁর অন্তর্ধানে বিশপ সেখানে কায়েম হয়ে বসে এই আজন্ম হতভাগ্যের মনের সকল গ্লানি সকল দুঃখ বেদনা নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দিয়ে তাকে আলো দেখিয়ে পথ চালাতে লাগলেন।

জাঁ ভাল্‌জাঁ অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে তার অন্তরের গ্লানি আরও সাফ হয়ে গেল। তার গত জীবন, তার প্রথম অপরাধ, সুদীর্ঘ দিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত, তার বাহ্যিক পশুত্ব, তার ভিতরকার দৃঢ়তা, তার মুক্তি, বিশপের করুণা, সর্বশেষে বালক জেয়রভের আধুলি—সবকিছুই একটির পর একটি বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল এবং তাতে করে সে যেরকম তৃপ্তি পেল, জীবনে আর কখনও

সেরকম পায় নি। তার গত জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে ভয়ে শিউরে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে হাফ্ ছেড়ে বাঁচল। কারণ, আজ সে শয়তানকে মহত্তের দৃষ্টি দিয়ে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

সাত

কতক্ষণ সে কেঁদেছিল, তারপর কি করল, কোথায় গেল কেউ তা জানল না। তবে কেউ কেউ বললে যে, সেই দিনই রাত তিনটার সময় ডাকগাড়ি যখন বিশপের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যায় তখন কে নাকি একটা লোক হাঁটু গেড়ে দূর থেকে কাকে প্রণাম নিবেদন করেছে।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিশের অদূরে একটি ছোট্ট শহরের নাম এম্-সুর-এম্। অনেক কাল থেকেই এখানে আসল চুনির নকলে একরকম সস্তা কালো জিনিস তৈরির ব্যবসা চলে আসছিল এবং অনেকেই সেই ব্যবসায়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। এ সব সস্তা চুনি ইউরোপের মেয়েরা অলঙ্কারে ব্যবহার করত। আসল চুনির দাম অনেক, তাই সাধারণের পক্ষে তার ব্যবহার সম্ভব ছিল না।

১৮১৫ সালের শেষাশেষি একজন নতুন মানুষ এসে এই শহরে বাস করতে শুরু করেন। তিনি সামান্য মূলধন নিয়ে এই ব্যবসায় পত্তন করেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ে ও একটি নতুন রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কারবারে যুগান্তর এনে ফেললেন। তাঁর কারখানায় তৈরি চুনি এত সুন্দর যে খাঁটি চুনিও তার কাছে কিছু না। পাকা মনিকারও সময় সময় তা খাঁটি কি মেকি ধরতে পারত না। অথচ জিনিসের দাম যেমন তিনি কমিয়ে দিলেন, জিনিসও তেমনি ভাল হতে লাগল। আর সে সঙ্গে কারিগরদের মজুরিও তেমনি বাড়িয়ে দেওয়া হল। ফলে ছোট্ট শহরটির অবস্থাও দেখতে দেখতে বদলে গেল।

লোকটি বছর তিনেকের মধ্যেই বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে

পড়লেন। এবং ব্যবসায়ে তাঁর সঙ্গে যারা যারা যোগ দিয়েছিল তাদের সকলকার অবস্থাও আগের চেয়ে উন্নত হল। এ ক্ষেত্রে তিনি নবাগত, এ ব্যবসায় তিনি নতুন করেছেন, এর আগে তিনি কোথায় ছিলেন, কি করতেন—কেউ সে খবর জানে না, এবং কেমন করে যে তিনি এ ব্যবসায়ে প্রথম প্রবেশের অধিকার পেলেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবসায়টি একচেটিয়া করে নিলেন তাও সকলেরই অজ্ঞাত। লোকে বলে তিনি যখন এ শহরে আসেন তখন তাঁর টাকা-কড়ি বলতে গেলে বিশেষ কিছুই ছিল না, অন্তত এত বড় ব্যবসায় চালাবার মত প্রচুর মূলধন তাঁর যে ছিল না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিজের একান্ত একাগ্রতা দিয়ে উপায় উদ্ভাবন করলেন। তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তি ওই সামান্য মূলধনের সাহায্যে তাঁকে বিপুল অর্থের অধিকারী করে তুলল। এবং শুধু তিনি নিজেই অর্থশালী হলেন না, সেই প্রদেশের সকলের অবস্থাও সচ্ছল করে তুললেন। শহরে যখন প্রথম আসেন তখন তাঁর সাজপোশাক ছিল নেহাৎ শ্রমিকের মত। কিন্তু তাই বলে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর এতটুকুও পরিবর্তন এল না। শীতকালের এক রাত্রিতে তিনি এসে শহরে উপস্থিত হন। পিঠে ছিল তাঁর মস্ত বড় একটা ঝোলা, হাতে একগাছি মোটা লাঠি। তিনি যে দিন প্রথম এসে পৌছান সেই দিনই রাত্রে টাউনহলে কেমন করে আগুন লেগে যায়। এই ভদ্রলোক নিজের জীবন বিপন্ন করে আগুনের লেলিহান শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিসের বড়কর্তার ছেলে দুটিকে বাঁচালেন। তাই, এহেন পরোপকারীর সম্বন্ধে কেউ কোন অসঙ্গত প্রশ্ন করার কথা ভাবতেও পারল না। এর থেকেই সকলে তাঁর নাম জানতে পারল, তিনি নিজের নাম বললেন—ফাদার মাদ্‌লেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথার চুলে দস্তুর মত পাক ধরেছে, চোখ দুটি জল্‌জলে, মন চিন্তায় আকুল, মুখে একটা অপূর্ব প্রশান্তি।

তিনি লোকজনের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেন না। চালে চলনে নেহাৎ সাদাসিধে। সকালে বিকালে বেড়ানোটা তাঁর এক মস্ত শখ।

তাঁর এ শহরে আসার আগে এখানকার সব কিছুই ছিল প্রাণহীন কিন্তু দেখতে না দেখতে সব কিছুই যেন নবজীবন লাভ করল। ব্যবসা পরিচালনায় তাঁর এত কৃতিত্ব যে, ইউরোপের কোথাও তাঁর পণ্যের প্রচার বাকি ছিল না। লোকের দুঃখ কষ্ট অনেকটা লাঘব হল। সকলেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করতে পারল, ঘরহারা নিরাশ্রয় তাঁর কাছে আশ্রয় পেল। ছেলেপিলেদের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুলতে তিনি অকৃপণভাবেই চেষ্টা করতেন।

ব্যবসায়ে অত অত টাকা উপার্জন করেও তাঁর মনের এতটুকু পরিবর্তন হয় নি, নিজের জন্মে তিনি কিছুমাত্র ভাবতেন না, ভাবনা তাঁর যা-কিছু সবই পরের জন্মে। বছর পাঁচের মধ্যেই তিনি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা জমিয়ে ফেললেন। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, তিনি কত টাকা রোজগার করেছিলেন। শহরের সর্ববিধ উন্নতি ও গরিবদের সাহায্যের জন্মে এর দ্বিগুণেরও বেশি খরচ করেছেন। শহরের হাসপাতাল এতদিন অর্থের অভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল, তাঁর সাহায্যে আবার তা সচল হয়ে উঠল। এবং আরও দশটি রোগীর থাকার ব্যবস্থা হল।

শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত। তিনি যে অংশে বাস করতেন সে অঞ্চলে একটি অতি জীর্ণ বাড়ীতে নামমাত্র একটি ইস্কুল ছিল। তিনি সর্বাগ্রে দুটি পাকা বাড়ী তৈরি করিয়ে দুটি ইস্কুল স্থাপন করলেন। একটি ছেলেদের, অপরটি মেয়েদের জন্মে। সরকারের দেওয়া সাহায্য থেকে শিক্ষকেরা অতি সামান্য পারিশ্রমিক পেতেন, কাজেই পড়াশুনায় তাঁরা তেমন বিশেষ মনোযোগী হতে পারতেন না। ইনি তাঁদের

মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে বাড়তি টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিতে লাগলেন। এ বিষয়ে কেউ এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলতেন, 'দেশের জন্যে সর্বাগ্রে যে দুটি জিনিস আবশ্যক—সে হল গিয়ে নার্স আর শিক্ষক।'

ফাদার মাদলেন নিজের ব্যয়ে বৃদ্ধ ও পঙ্গু শ্রমিকের সাহায্যের জন্য একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করলেন। শ্রমিকদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রথম প্রথম লোকেরা বলাবলি করত, ভদ্রলোক বড়লোক হতে চায়। কিন্তু পরে যখন তারা দেখল যে, তাঁর বড়লোক হওয়ার অর্থই হচ্ছে শহরের সকলকে বড়লোক করে তোলা, তখন তারাই আবার বলতে শুরু করল, 'লোকটা খ্যাতি-প্রতিপত্তি চায়।' তাদের ওরকম ধারণার মূলে যে সত্য ছিল না এমন কথা বলা যায় না। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, বাইবেলের উপদেশ জীবনে কাজের দ্বারা প্রতিপালন করতে চেষ্টা করতেন। সেকালে এরকম লোক জনসাধারণের শ্রদ্ধাপ্রীতি সহজেই অর্জন করতেন। প্রত্যেক রবিবার তিনি গির্জায় যেতেন। ওই প্রদেশের যিনি পার্লামেণ্টের সদস্য, তিনি সকলকেই সদস্য-পদের প্রার্থী বলে সন্দেহ করতেন। মাদলেনের ধর্মানুরাগ দেখে তিনি ভাবনায় পড়লেন, কারণ ধর্মে তাঁর এতটুকু আস্থা ছিল না। ভগবানকেও উপহাস করতে তাঁর দ্বিধা আসত না। মাদলেন ধনী ব্যবসায়ী, তিনি নিয়মিত গির্জায় যান এবং হয় ত তিনি সদস্যপদের প্রার্থী হবেন, এই আশঙ্কা সদস্য মহাশয়কে পেয়ে বসল। নির্বাচনে মাদলেনকে তিনি পরাস্ত করবেন মনে মনে স্থির করে দুবেলাই গির্জায় যাতায়াত করতে শুরু করলেন। কেন না, সরকারী উচ্চপদ লাভ করতে হলে তখনকার দিনে গির্জায় গতিবিধিটা অপরিহার্য বলে গণ্য হত। তা ছাড়া, হাসপাতালেও দুটি রোগীর থাকবার ব্যবস্থা

করলেন। মাদলেনের অর্থে দশ জনের ব্যবস্থা পূর্বে হয়েছিল। ফলে গরিবদেরই উপকার হল।

এ দিকে ১৮১৯ সালে শহরের সর্বত্র গুজব রটে গেল যে, দেশের কল্যাণের জন্যে তিনি যে সকল লোকহিতকর কার্য করেছেন, তাঁর জন্যে রাজা তাঁকে শীঘ্রই এম্—শহরের মেয়রের পদে মনোনীত করবেন ঠিক হয়ে গেছে। যারা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিল, মাদলেন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টায় আছেন, তাঁরা এ খবরে নিজেদের দূরদর্শিতায় উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল, 'কেমন, বলি নি! শহরের সকলেই এই খবরটি নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করে দিল। খবরটা আসলে ভিত্তিহীন নয়। দিন কয়েক যেতে না যেতেই তাঁর নিয়োগের খবরটা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হল। পর দিনই তিনি এই সম্মান গ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে মেয়রের পদ প্রত্যাখ্যান করলেন।

সে বছরের শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁর আবিষ্কৃত নতুন পদ্ধতি প্রদর্শিত হল এবং বিশেষজ্ঞেরা সে সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জানালে রাজা মাদলেনকে বিশেষ খেতাবে সম্মানিত করলেন। শহরে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল। জনসাধারণের কেউ কেউ বলতে লাগল, 'বটে! মাদলেন তলে তলে উপাধির জন্যে চেষ্টা করছিলেন!'

কিন্তু মাদলেন খেতাব গ্রহণে অসম্মত হলেন।

তখন লোকে স্বীকার করল, 'তাঁর মতলব বোঝবার উপায় নেই!' আবার কেউ কেউ বলল, 'লোকটার কি দেমাক! মেয়রের পদেও খুশি হতে পারল না, ও ক্রশ চায়!' কিন্তু তিনি যখন ক্রশ গ্রহণেও রাজি হলেন না, তখন শহরের নর-নারী তাঁকে একটা প্রহেলিকা বলেই মনে করল।

আমরা দেখেছি, ওই প্রদেশ মাদলেনের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে তিনি অনেক কিছু করেছিলেন

বিশেষ করে, গরিবদের ত কথাই নেই। তাঁর অবসর এত কম ছিল যে, তিনি সম্মান গ্রহণেরও সময় পেতেন না। তাঁর আচার ব্যবহার এত নম্র, এত ভদ্র যে, তাঁকে ভাল না বেসে থাকতে পারা যেত না। তাঁর কারখানার মজুরেরা তাঁকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা ভক্তি করত। এবং তাদের এ শ্রদ্ধাভক্তি তিনি একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে গ্রহণ করতেন। লোকে যখন তাঁকে ধনবান বলে জানতে পারল, সমাজেও তখন তাঁর খাতির সম্মানের সীমা রইল না। তারা তাঁকে মঁসিয়ে মাদলেন বলে সম্বোধন করতে লাগল। কারখানার কারিগরেরা ও বালকেরা তাঁকে ফাদার মাদলেন বলেই ডাকত। তাদের এ ডাকে তিনি খুব খুশিই হতেন।

ক্রমে চারদিক থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। সমাজে তাঁর একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা হল। এক কথায় বলতে গেলে, সমাজও তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে এগিয়ে এল। যে সকল বৈঠকে একদিন শিল্পী বলে তাঁর প্রবেশের অধিকার ছিল না, এখন তারা লক্ষপতি মাদলেনকে বৈঠকখানায় অভ্যর্থনার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করল, তাঁর প্রবেশের জন্যে দরজা একেবারে উন্মুক্ত হল। কিন্তু তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। যে বৈঠকখানা-ঘরে আগে কারিগরেরা বসে কর্তার সঙ্গে ব্যবসায় সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করত, সেখানে এখন দেশের বড় বড় লক্ষপতিদের আনাগোনা শুরু হল। কত লোক তাঁর কারবারে টাকা খাটাবার জন্যে নিজের নিজের সঞ্চয় তাঁকে দিতে রাজি হল, কিন্তু তিনি সে সব টাকা গ্রহণে অস্বীকার করলেন। এ সম্বন্ধেও লোকেরা বলাবলি করত: 'লোকটা বোঝে না কিছু, তারপর লেখাপড়ায় ত মা-গঙ্গা! কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর, এতদিন কোথায় ছিল, কি করত, কেউ তা জানে না। ভদ্র সমাজে ওর স্থান নেই।' তিনি যখন প্রচুর টাকা উপার্জন

করতে লাগলেন তখন তারা বলত : 'লোকটা একের নম্বরের বেনে!' তিনি যখন দুহাতে গরিব-দুঃখীকে অর্থ সাহায্য করতেন, যখন জনগণের কল্যাণের জন্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন তখন তারাই আবার বলত : 'লোকটা সুনাম চায়, প্রতিষ্ঠা চায়!' আবার যখন রাজার দেওয়া সম্মান খেতাব নিতে অসম্মত হলেন, তখন তারাই বলতে লাগল : 'লোকটা খেয়ালী!' আবার যখন শৌখিনতাকে তিনি এড়িয়ে চলতেন তখন তারা বলত : 'লোকটা একেবারে বর্বর, গেঁয়ো! ভব্যতা জানে না!'

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। এর মধ্যে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্ম তিনি অনেক কিছুই করেছেন। রাজা এবার সকলকার সম্মতি নিয়ে তাঁকে পুনরায় ১৮২০ সালে এম্—শহরের মেয়র নিযুক্ত করলেন। তিনি এবারেও ওই পদ গ্রহণে অসম্মতি জানালেন। কিন্তু দেশের শাসনকর্তা তাঁর অসম্মতিকে গ্রাহ্য করলেন না। দেশের বড় বড় লোকে এসে তাঁকে অনুরোধ জানালেন, জনগণও তাঁর কারখানা-বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় সমবেত হয়ে তাঁকে সনির্বন্ধ উপরোধ করতে লাগল। সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি নিরুপায় হয়ে রাজি হলেন। লোকে লক্ষ্য করল, বিশেষ করে একটি বুড়ীর কথায় তিনি ওই দায়িত্বভার গ্রহণে মতিস্থির করলেন। বুড়ী নিজের ঘরের দরজা থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'মেয়র সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী হলে জনসাধারণের পরম উপকার হয়। আমাদের সে উপকারে আপনার যোগ্যতা আছে, সুতরাং আপনি অসম্মত হয়ে আমাদের অপকার করতে পারেন না।'

এত সম্মান, এত টাকা-পয়সা—কোন কিছুতেই তাঁর মনের এতটুকু পরিবর্তন আনতে পারল না। মাথার চুলগুলি সব বরফের মত সাদা হয়ে গেছে, স্থির দৃষ্টি, শ্রমিকের মূর্তির মত গাম্ভীর্যময় মুখমণ্ডল।

যেন পাথরে খোদা দার্শনিকের মত চিন্তাশীল আকৃতি—তাঁকে বড় মানাত। একটা মোটা টুপি ও সাধারণ মোটা কাপড়ের একটা লম্বা কোট, তাতে আগাগোড়া গলা পর্যন্ত বোতাম। মেয়রের নির্দিষ্ট কাজটুকু নীরবে শেষ করে একাকী থাকতেই তিনি পছন্দ করেন। কথাবার্তা তিনি বেশি কইতে ভালবাসেন না এবং নিজের প্রশংসা শুনবার এতটুকু আগ্রহও তাঁর ছিল না। যখন হাসতেন, তখন প্রাণ খুলেই হাসতেন। খোলা মাঠে একা বেড়াবার শখ তাঁর বড় বেশী রকমই ছিল। খেতে খেতে বই পড়া তাঁর অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নিজের একটা ছোট-খাট বাছাই-করা-বইয়ের সংগ্রহ ছিল। বই তিনি বড় ভালবাসতেন, কেন না, তারা কথার জবাব দিতে না পারলেও তাদের বন্ধুত্বে এতটুকু ভেজাল নেই। প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে খাটুনি অনেকটা লাঘব হয়েছিল বটে, কিন্তু অবসর সময়টা তিনি জ্ঞানার্জনেই অতিবাহিত করতেন। যতই দিন যেতে লাগল ততই তাঁর ব্যবহার অধিকতর ভদ্র, নম্র ও অমায়িক হতে লাগল।

যখন বেড়াতে বের হতেন তখন সব সময়ই তিনি একটি বন্দুক সঙ্গে রাখতেন, কিন্তু কখনও বড়-একটা ব্যবহার করতেন না। তবে যখন ব্যবহার করা দরকার হয়ে পড়ত তখন তাঁর লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হত না। তিনি কখনও নিরীহ প্রাণী বা ক্ষুদ্র পাখী হত্যা করেন নি। বয়স তাঁর অনেক হলেও দেহে অসুরের মত বল ছিল। কেউ কখন সাহায্য চেয়ে তা না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরেছে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। নিজে বড়লোক হলেও সামান্য কাজ করতেও তাঁর মনে কোন সংকোচ দেখা যেত না। রাস্তা চলতে গিয়ে দেখলেন, কারুর ঘোড়া পড়ে গেছে, তিনি গিয়ে তুলে দিয়েছেন, কারুর গাড়ির চাকা কাঁচা মাটির রাস্তায় কাদায় বসে গেছে, তিনি তখুনি ছুটে গিয়ে

কাঁধ দিয়ে তুলে দিয়েছেন; ক্ষ্যাপা বলদ ছুটেছে, কেউ ধরতে পারছে না, তিনি সোজা এগিয়ে গিয়ে অনায়াসেই তার শিং দুটি ধরে তাকে হেলায় আটক করেছেন। বেড়াবার সময় পকেটভরতি পয়সা ও একআনি নিয়ে বের হতেন এবং বাড়ী ফিরলে দেখা যেত, তার একটি পয়সা বা আনিও পকেটে নেই। গ্রামের ভিতর বেড়াতে গেলে গরিব ছেলেমেয়েরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত। এতদিন যে তিনি গ্রামেই বাস করে এসেছেন, তিনি যে গ্রাম্য লোক তা তাঁর আচরণেই ধরা পড়ত। কেন না, গ্রাম্য লোকের মত তিনি অনেক বিষয়ই জানতেন এবং আবশ্যক মত উপদেশ দিতেন। চাষীরা তাঁর উপদেশে প্রচুর শস্য উৎপাদন এবং সেই ফসল রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারত। তিনি সকল সময়েই বলতেন, দুনিয়ার কিছুই খারাপ নয়, কেউ খারাপ নয়—আসলে পারিপার্শিকের জন্যই যা-কিছু খারাপ হয়।'

ছেলেমেয়েরা তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে, কেন না, তাদের খুশি করবার কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করতেন না। খেলনা, ছবি, খাবার—সব সময়েই যোগাতেন। প্রতিবেশী কারুর মৃত্যু হলে তিনি শব সৎকারের জন্যে এগিয়ে যেতেন। কেউ দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে শুনবামাত্রই তিনি বুক পেতে দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেন। মন্দিরে স্তব ও প্রার্থনা শুনতে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না, সুযোগ পেলে কখনও তিনি তা উপেক্ষা করেন নি। বহু জনহিতকর কাজ করতেন, দান-খয়রাতেরও সীমা ছিল না, কিন্তু সে সবই গোপনে, কোন একটা ভাল কাজ করে ঢাক পিটিয়ে লোকদের জানানো পছন্দ করতেন না।

টাকা-কড়ি ছিল তাঁর অগাধ, কিন্তু কখনও তিনি তাই নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করেন নি। তিনি ভাগ্যবান বটে কিন্তু তিনি যে সুখী তা তাঁকে দেখলে কখনও মনে হত না। কেউ কেউ বলত, তিনি অদ্ভুত লোক। তাঁর শয়ন-ঘরখানি ঠিক সাধুসন্ন্যাসীদের মত আড়ম্বরহীন। আসবাব

পত্রের মধ্যে দুটি সেকেলে ধরণের রূপার বাতিদান কুলুঙ্গিতে বসান আছে।

১৮২১ সালের গোড়ার দিকে ডি—শহরের সেই মহানুভব বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যুর খবর সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় বিরাশী বছর হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অন্ধ হয়ে যান, কিন্তু তাঁর বোন কাছে থাকায় কোন কষ্টই তাঁর হয় নি।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল, মঁসিয়ে মাদ্‌লেন শোক-চিহ্ন স্বরূপ কালো পোশাক পরেছেন। ফলে নানা লোকে নানা কথা আলোচনা করতে লাগল। কেউ কেউ স্থির করে বসলো যে, বিশপের সঙ্গে মাদ্‌লেনের নিশ্চয় রক্তের সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। শৌখিন লোকদের বৈঠকখানায় লোকে বলাবলি করে, 'মাদ্‌লেন বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যু-সংবাদে শোকচিহ্ন ধারণ করেছেন।' এতে তাঁর উপর লোকের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। মাদ্‌লেন বিশপের নিকট-আত্মীয় হতে পারে মনে করে তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় শৌখিনদের আর কোন দ্বিধা রইল না। তাঁকে দেখলে বুড়ীদের সৌজন্য ও যুবতীদের হাসিমুখে সম্ভাষণের আতিশয্য দেখে মাদ্‌লেন বুঝলেন যে, সমাজের লোক তাঁকে উচ্চশ্রেণীর বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। শৌখিন সমাজের এক বুড়ী তাঁকে কৌতূহল বশে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মেয়র মহাশয়, বিশপ মিরিয়েল কি আপনার নিকট-আত্মীয় ?'

মাদ্‌লেন জবাবে বলেছিলেন, 'না।'

বুড়ী জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে তাঁর মৃত্যুতে আপনি যে অশৌচ ধারণ করেছেন ?'

মঁসিয়ে মাদ্‌লেন এর জবাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ছেলেবেলায় আমি ছিলাম বিশপের চাকর।'

আর একটি বিষয়েও লোকে আকৃষ্ট হল। যে সব অল্পবয়স্ক বালক দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় ও চিমনি পরিষ্কার করে তাদের কাউকে দেখতে পেলে মেয়র তাকে ডাকিয়ে নিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করতেন, টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করতেন। ওই সব ছেলে এ বিষয়ে বলাবলি করত, ফলে তাদের অনেকেই লোভের বশে এম্—শহরের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল।

আট

কালক্রমে তাঁর উপর সমাজের বিরূপতা চলে গেল। প্রথম প্রথম লোকে তাঁর নিন্দা করত। তাঁর দোষ কল্পনা করে নিত। যে-কেউ বড় হয়েছেন তাঁকেই এ অবস্থায় পড়তে হয়েছে, যেন এরকম হওয়াটাই সাধারণত দস্তুর। ক্রমে লোকে আর নিন্দা করত না, তবে তাঁর প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করত। পরে তাও আর করত না। কখনও কখনও কেউ কেউ দুষ্টবুদ্ধির বশে দু-এক কথা বলে বেড়াত মাত্র। এ ভাবটাও চলে গেল। তখন সকলে একবাক্যে তাঁর প্রতি আন্তরিক সম্মান দেখাতে শুরু করল। ক্রমে এমন হল যে, ১৮১৫ সালে ডি—শহরের বিশপ সম্বন্ধে সে শহরের জনগণের যে ধারণা ছিল, ১৮২১ সালে এম্-সুর-এম্ শহরের মেয়র সম্বন্ধেও এ শহরের জনসাধারণ সে রকম শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সমীহ প্রদর্শন করতে লাগল। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূর থেকে লোকে তাঁর পরামর্শ নিতে আসত। তিনি সকল বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দিয়ে বিরোধী দু-দলের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করে দিতেন। ফলে লোকেরা আর আইন-আদালতের আশ্রয় নিত না। সকলেই তাঁর উপর বিচারের ভার দিত। তাদের এ রকমটা করবার কারণও ছিল। যে আইন মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস তিনি যেন তার অবতার ছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিটা যেন সংক্রামক হয়ে ছ-সাত বছরে ক্রমে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

দুনিয়াসুদ্ধ লোক যাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাঁকে মেয়র নির্বাচন করায় সকলেই অন্তরের সঙ্গে খুশি হল, কিন্তু শহরের একটি লোকের মনে তাঁর প্রভাবের ছায়াপাতও হ'ল না।

সর্বজনসমাদৃত শ্রদ্ধেয় মেয়র মাদলেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, তখন অনেক সময় দেখা যেত একজন দীর্ঘকায় লোক তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। লোকটির পোশাক খাকি রঙের। হাতে একখানি মোটা বেতের লাঠি, মাথায় পুরানো একটি টুপি। যতক্ষণ মাদলেন দৃষ্টির অন্তরালে না যেতেন ততক্ষণ এই লোকটি তাঁর দিকে সমানে তাকিয়ে থাকত। তারপর দুহাত একত্র করে ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে ভ্রূ কুঁচকে আপন মনেই বলত, 'এ কে? নিশ্চয় একে কোথায় যেন দেখেছি। এ যা-ই করুক, আমি প্রতারিত হব না।'

লোকটির গাম্ভীর্য অন্যের ভীতির উদ্রেক করত। মুহূর্তের জন্যেও সে দৃষ্টিপথে পড়লে দর্শকের মনোযোগ তার দিকে আকৃষ্ট হত। সে হচ্ছে পুলিসের ইন্সপেক্টর জাভেয়র। সে কিছুতেই কেন যেন মাদলেনকে বরদাস্ত করতে পারছিল না।

ইন্সপেক্টর জাভেয়রের কাজ লোকের প্রীতির উদ্রেক না করলেও অপরিহার্য। সে মাদলেনের প্রথম অবস্থা দেখে নি। সে প্যারিস পুলিসের প্রধান অধ্যক্ষের দয়ায় এ কাজ পেয়েছে। এম্‌-সুর-এম্‌ শহরে আসবার আগেই মাদলেন প্রভূত ধনশালী হয়েছিলেন এবং তখনই লোকে তাঁকে মঁসিয়ে মাদলেন বলতে শুরু করেছে।

জাভেয়রের চরিত্রে ও আকৃতিতে পুলিস-সুলভ রূঢ়তা ও প্রভুত্বের জটিল সংমিশ্রণ লক্ষিত হ'লেও তার মধ্যে পুলিসী নিচতা ছিল না।

* * *

জাভেয়রের জন্ম হয় কারাগারে। তার মা লোকের হাত গুণে ভাগ্য বলত। তার বাবা কারাদণ্ড ভোগ করার পর নৌকায় কাজ করত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জাভেয়র দেখল, সমাজে তার স্থান নেই, স্থান পাবার আশাও নেই। সে দেখল, সমাজে দু শ্রেণীর লোকের স্থান নেই,—যারা সমাজকে আক্রমণ করে ও যারা সমাজকে রক্ষা করবার জন্যে

পাহারায় নিযুক্ত আছে, সমাজের কাছে তার অপরাধ অমার্জনীয়। তবু এই দু শ্রেণীর মধ্যে সে কোন্ শ্রেণীভুক্ত হবে, তাই তাকে স্থির করতে হবে। সে বুঝতে পারল, নিয়ম মেনে চলা, কোন অবস্থায়ই নিয়ম লঙ্ঘন না করা এবং কোনও রকম প্রলোভনে লুব্ধ না হওয়া তার প্রকৃতির আসল ভিত্তি। অধিকন্তু সে যে-শ্রেণীতে জন্মেছে, তার প্রতি তার বিদ্বেষ এত প্রবল যে তা বর্ণনা করা যায় না। অতএব পুলিসের কাজে প্রবৃত্ত হ'ল ; তাতে সাফল্যও লাভ করল : চল্লিশ বছর বয়সে ইন্সপেক্টরের পদ পেল।

যৌবনে সে দক্ষিণ প্রদেশের কারাগারে নিযুক্ত ছিল।

জাভেয়রের নাক চেপটা। নাকের রন্ধ্রদ্বার গভীর ; গোঁফ জোড়া অতি বৃহৎ। দেখলেই তাকে ভয় হয়। জাভেয়রের মুখে প্রায়ই হাসি দেখা যেত না। কিন্তু সে যখন হাসত তখন তার নাকের পাশে চেপটা ভাঁজ পড়ত। তখন তাকে দেখলে বন্য পশুর মত মনে হত। হাসবার সময় তাকে বাঘের মত দেখাত। তার মাথাটি ক্ষুদ্র, চোয়াল বৃহৎ। মাথার চুলে কপাল ঢাকা। তাকে দেখলেই মনে হয়, সে যেন সব সময়েই রেগে আছে, তার চক্ষুর দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা ছিল না। মুখখানি কুঞ্চিত রেখায় পূর্ণ ও ভীষণ। তাকে দেখলেই মনে হয়, কোনো নিষ্ঠুর কাজ করতেই সে পিছ-পা নয়।

তার মন দুটি ভাবের সমন্বয়ে গঠিত। ওই ভাব দুটি সাধারণত সরল ও উত্তম বলেই গণ্য। কিন্তু তার অতিমাত্রায় ব্যবহারে সে তাকে মন্দে পরিণত করেছিল। ওই দুটি ভাবের একটি শাসকদের আদেশের প্রতি একান্ত আনুগত্য, দ্বিতীয়টি বিদ্রোহের প্রতি বিদ্বেষ। নরহত্যা, চুরি ইত্যাদি সকল অপরাধই তার দৃষ্টিতে বিদ্রোহের বিভিন্ন রূপ মাত্র। দেশের প্রধান মন্ত্রী থেকে সামান্য পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত, যে-কেউ শাসন-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত, তাদের সকলকেই সে গভীরভাবে সম্মান

করত, এ বিষয়ে তার মনে কোনও দ্বিধা উপস্থিত হত না। যে-কেউ দেশের আইন লজ্ঘন করে অপরাধী হত, তাকেই সে ঘৃণা করত, তার প্রতি বিরক্তি ও অবজ্ঞা প্রকাশ করত। কোন কারণেই তার মনের ভাবের ব্যতিক্রম ঘটত না। এর যে কোন ব্যতিক্রম থাকা সম্ভব, তাও সে স্বীকার করত না। সে বলত, 'শাসনকর্তার কখনও ভুল হতে পারে না। বিচারক কখনও অন্যায় করতে পারে না।' আবার অন্য দিকে বলত, 'অপরাধী অপরাধ করে চিরদিনের জন্য উৎসন্নে গেছে, তার অপরাধ কখনো মুছে ফেলা যায় না। তার কাছে কোন শুভ ফলের আশা করা যায় না।' সে কোন বিষয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠত না, দুঃখেও তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তার আকৃতি নীরস, ভাবে একটুকুও চপলতা ছিল না, কেবলই কল্পনার জাল বুনে চলত। তুরপুনের মত তার দৃষ্টি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করত। সে দৃষ্টিতে কারুর প্রতি এতটুকু প্রীতির পরিচয়ও পাওয়া যেত না। একান্ত অভিনিবেশের সঙ্গে সে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখত ও তার খবরদারি করত, এই ছিল তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। মানুষের স্বভাব কতই না বিচিত্র, এত বৈচিত্র্য আর কোথাও নেই। জাভেয়র তার এই বিচিত্র প্রকৃতিকে একটি নিয়মে বাঁধতে চেষ্টা করত। সে যখন যে কাজে নিযুক্ত থাকত, সে কাজ শেষ করাই ছিল তার একমাত্র তপস্যা, একমাত্র ধর্ম। কাজেই, যে হতভাগ্য একবার তার কবলে পড়ত তার আর রক্ষা ছিল না। তার বাবা যদি কারাগার থেকে পালাত, তা হলে সে বাপকেও ধরিয়ে দিত। তার মা অধর্ম করলে, তার দোষোদ্‌ঘাটন করতেও সে কখনও কুণ্ঠিত হত না। লোকে ধর্মাচরণে যেরূপ সুখ অনুভব করে, সেও ওই কাজের মধ্যে সে রকম সুখ অনুভব করত। অভাবের জন্যে অনেক কষ্টই সে ভোগ করেছে। সংসারে কেউ তার দোসর ছিল না। সে কর্তব্যের কাছে নিজেকে বলি দিয়েছিল।

আমোদে-প্রমোদে সময় নষ্ট সে কখনই করে নি। অপরাধীকে ধরবার প্রতীক্ষায় সে নির্মম হৃদয়ে অপেক্ষা করত। নির্দয় হয়ে দোষীকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। প্রলোভন তার কঠোর হৃদয়কে কখনও দূষিত করতে পারে নি।

জাভেয়রের আকৃতি গুপ্তচরের কাজের উপযোগী। এক কথায় বলতে গেলে, জাভেয়র পুলিস কর্মচারীর প্রতিকৃতি। তার কপালটি সব সময়েই টুপিতে ঢাকা থাকত। তার চোখ দুটো দেখা যেত না, ভ্রূযুগলে ঢাকা থাকত। চিবুক দেখা যেত না, গলাবন্ধে ঢাকা থাকত। হাত দেখা যেত না, আস্তিনের মধ্যে গুটান থাকত। তার ছড়ি দেখা যেত না, কোটের নীচে লুকানো থাকত। সময় উপস্থিত হলে লুক্কায়িত শত্রু যে রকম অতর্কিতে সামনে এসে পড়ে, সে রকম তার অপ্রশস্ত তীব্র ললাট, অদ্ভুত দৃষ্টি, ভীতিজনক চিবুক, প্রকাণ্ড হাত, ভীষণ লাঠি গুপ্তস্থান থেকে সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

তার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না। কোন কাজে সফল হলেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নস্য নিতে শুরু করত। আর সকলের সঙ্গে এইখানেই তার সাদৃশ্য ছিল।

যে সব লোকের স্থায়ী বাসস্থান নেই বা যারা জীবিকা অর্জনের জন্য কোন নিয়মিত কাজ করে না, তারা সকলেই জাভেয়রকে অত্যন্ত ভয় করত। তার নাম শুনলেই তারা পলায়ন করত এবং তাকে দেখলে তারা পাথর ব'নে যেত।

জাভেয়র ছিল এই রকম দুর্দান্ত ব্যক্তি।

মাদ্‌লেনের প্রতি তার সর্বদা লক্ষ্য ছিল। তার মন তাঁর সম্বন্ধে সব সময়েই সন্দেহাকুল এবং সে মাদ্‌লেন সম্পর্কে বহুবিধ অনুমান করত। ক্রমে মাদ্‌লেনও তা বুঝতে পারলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর মধ্যে কোনও উদ্বেগ প্রকাশ পেল না। তিনি জাভেয়রকে কোন দিন কোন প্রশ্ন

করেন নি। ইচ্ছে করে কখনও জাভেয়রের সঙ্গে সাক্ষাতও করেন নি। কিন্তু তাই বলে তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টাও তাঁর ছিল না। জাভেয়র যে ভাবে তাঁর দিকে তাকাত, তা বিরক্তিকর, তাতে অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু মাদ্‌লেন সে দিকে আদৌ মন দিতেন বলে মনে হয় না। তিনি আর পাঁচ জনের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করতেন, আর পাঁচ জনের প্রতি যে রকম শিষ্টাচার দেখাতেন, জাভেয়রের সঙ্গেও সে রকম সহজভাবে ও সেরূপ শিষ্টাচারের সঙ্গে ব্যবহার করতেন।

পূর্বে যা বলা হয়েছে, তাতে মনে হতে পারে যে সংস্কার যে পথ দেখিয়ে দেয় তা একেবারে অভ্রান্ত। সেই ভুল দূর করার জন্যে এখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের সংস্কার অভ্রান্ত নয়। পথের নির্দেশ করতে গিয়ে সংস্কার ভুল করে বিপথ দেখিয়ে দেয়, এবং তাতে মানুষের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়ে যায়। তা না হলে, সংস্কার বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে উৎকৃষ্টতর হত এবং মানুষের চেয়ে পশুর সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট হত।

জাভেয়রের প্রতি মাদ্‌লেনের সহজ শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে তার মতলব যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জাভেয়রের এক দিনের আচরণে মাদ্‌লেন কিছুটা ভাবিত হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটি এই:

একদিন মাদ্‌লেন প্রাতে প্রতিদিনকার মত বেড়াতে বের হয়েছেন। অদূরে একটা ভিড় দেখে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, ফোশলভাঁ নামে ঘোড়ার গাড়ীর এক বুড়ো গাড়োয়ান নিজের গাড়ির চাকার তলায় পড়ে গেছে। ঘোড়াটিও পা পিছলে পড়ে গিয়েছে। কাঁচা মাটির পথ, আগের দিন রাতে বৃষ্টি হওয়ায় কাদা হয়ে রয়েছে। গাড়িখানি মাল বোঝাই। কাজেই চাকা ক্রমেই কাদার মধ্যে বসে যেতে লাগল।

ফোশলভাঁ চীৎকার করে উঠল। লোকজন যে যেখানে ছিল, তার চীৎকার শুনে তামাসা দেখার জন্যে সকলেই ছুটে এল, কিন্তু বৃদ্ধকে বাঁচাবার জন্যে কেউ এগিয়ে গেল না।

মঁসিয়ো মাদ্‌লেন উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কাছাকাছি কারুর জ্যাক * আছে?'

একজন উত্তর দিল, 'জ্যাক আনতে লোক পাঠানো হয়েছে।'

তিনি পুনরায় শুধালেন, 'আসতে কতক্ষণ লাগবে?'

আর একজন জবাব দিল, 'পনর-বিশ মিনিটের কম নয়।'

'বাঝাই গাড়ীর চাকা কাদায় বসে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আর কিছু কাল থাকলে বুড়ো ফোশলভাঁ আর বাঁচবে না। জ্যাক যখন নিয়ে আসবে, তখন হয় ত আর বুড়োকে জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে না।'

এই ফোশল্‌ভাঁ মাদ্‌লেনের প্রবল শত্রু। মাদ্‌লেন তা ভাল করেই জানেন। ফোশল্‌ভাঁ সামান্য লেখাপড়া জানে। ব্যবসা তার এক রকম চলছিল মন্দ নয়। কিন্তু তারই চোখের উপর সামান্য শ্রমিক মাদ্‌লেন দেখতে দেখতে শুধু বড়লোক নয়, গোটা ব্যবসাটাই একচেটিয়া করে ফেললেন, আর সে দু-বেলা দু-মুঠো ভাতেরও যোগাড় করতে পারছিল না। কাজেই মাদ্‌লেনের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ছিল। প্রাণপণে তাঁর ক্ষতি করবার জন্যেই সে চেষ্টা করে এসেছে। অবস্থা যখন এমনি দাঁড়াল যে, ব্যবসা সে আর কিছুতেই চালাতে পারে না, তখন নিরুপায় হয়ে ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে উদরান্নের সংস্থান করতে শুরু করল।

মঁসিয়ো মাদ্‌লেন চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ভাইসব,

---

* ভার তোলবার যন্ত্র-বিশেষ।

পনর-বিশ মিনিট দেরি সইবে না। তার আগেই আমাদের হতভগ্য বন্ধু মারা যাবে। এখনও সময় আছে, চেষ্টা করলে ওকে বাঁচান যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কি এমন শক্তিমান কেউ নেই যে, এই গাড়ীর চাকার নীচে কাঁধ দিয়ে গাড়িখানি একটু উঁচু করে তুলে ধরতে পারে? যে পারবে আমি তাকে দশটি টাকা বকশিশ দেবো।'

সকলেই মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন বলে উঠল, 'তা করতে অসুরের মত বল চাই। তা ছাড়া, যে কাঁধ দেবে তারও চাপা পড়ে মরবার সম্ভাবনা আছে।'

মাদ্‌লেন বললেন, 'বেশ, এসো, বিশ টাকাই দেবো।'

কেউ রাজী হল না। ইন্সপেক্টর জাভেয়রও ঠিক এই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে-ই কথাটার জবাব দিল, 'সকলেই লোকটিকে বাঁচাতে ইচ্ছুক, কিন্তু ওদের মধ্যে এমন কেউ শক্তিশালী নেই যে গাড়িখানিকে তুলে ধরতে পারে। অথচ ওখানে জায়গা এত কম যে এক জনের বেশি ছুজন ওখানে দাঁড়াতে পারে না।' এই সময় সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাদ্‌লেনের দিকে তাকাল। এবং পরে বলল, 'আপনি যে প্রস্তাব করছেন তা করতে পারে এমন লোক সারা ফরাসী মুলুকে মাত্র একজন আছে বলেই আমি জানি।'

এই কথায় মাদ্‌লেন একটু চম্‌কে উঠলেন। জাভেয়রের নজর মাদ্‌লেনের মুখের দিকে। সে বললে, 'আমি যার কথা বলছি সে একজন কয়েদী।'

মাদ্‌লেন জবাবে বললেন, 'তাই নাকি!'

'হাঁ, তুলোঁ জেলখানার কয়েদী। এখন সে কোথায়, জানিনে।' মুহূর্তের জন্যে মাদ্‌লেনের মুখখানা ছাইয়ের মত

বিবর্ণ হয়ে গেল। এই সময় ফাদার ফোশল্‌ভাঁ যন্ত্রণায় আর একবার ভীষণ আর্তনাদ করে উঠল। 'আমি মলাম! আমাকে বাঁচাও! তোমরা আমাকে বাঁচাও!'

করুণ আর্তনাদ শুনে মাদলেন একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু যে লোকগুলি ভিড় জমিয়ে তামাসা দেখছিল তারা কেউ এগিয়ে এল না। ইন্সপেক্টর জাভেয়রের শ্যেনদৃষ্টি তাঁর মুখের উপর। মুহূর্তের মধ্যে মঁসিয়ো মাদ্‌লেন তাঁর গায়ের কোটটি খুলে ফেললেন, তাঁর সবল দেহের পেশিগুলি যেন ফুলে উঠল। আর একটিও কথা না বলে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ভিড়ের মধ্যে কেউ একটি কথা বলবার আগেই তিনি গাড়ির তলায় উপুর হয়ে পড়ে চাকায় কাঁধ দিতে শুরু করলেন। দু-দু-বার তাঁর সকল শক্তি প্রয়োগ করেও তিনি গাড়িখানাকে একটুও উপরে তুলতে পারলেন না, ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, 'ফাদার মাদ্‌লেন, আপনি বেরিয়ে আসুন, তা না হলে আপনিও চাপা পড়বেন।'

এদিকে বৃদ্ধ ফোশল্‌ভাঁও সানুনয়ে বলে উঠল, 'মঁসিয়ে মাদ্‌লেন, আপনি সরে যান। আমি ত মরতেই বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও কেন মরণ ডেকে আনলেন!'

মাদ্‌লেন কোন জবাব দিলেন না। লোকগুলি হাঁপিয়ে উঠল। চাকা মাটির মধ্যে অনেকখানি বসে গেছে, এখন আর তাঁর পক্ষে বাইরে বেরিয়ে আসাও অসম্ভব। হঠাৎ গাড়িখানা নড়ে উঠল, চাকাগুলি কাদার মধ্যে আলগা।

মাদ্‌লেন অস্পষ্ট জড়িত স্বরে বললেন 'ভাইসব, এবার তোমরা সকলে মিলে সাহায্য কর।'

একসঙ্গে তারা প্রায় বিশ জন ছুটে গিয়ে গাড়িখানাকে তুলে ধরল

এবং ধরাধরি করে ফোশলভাঁকে চাকার নিচে থেকে বের করে নিয়ে এল। মাদ্‌লেন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখখানা ঘর্মাক্ত বিবর্ণ, জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, কাদাময়। ফোশলভাঁ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে টলতে টলতে গিয়ে মঁসিয়ো মাদ্‌লেনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। মাদ্‌লেনের চোখে মুখে আত্মপ্রসাদ জল্‌জল্‌ করে উঠল। ইন্সপেক্টর জাভেয়রের দৃষ্টি যেন তিনি আর সইতে না পেরে মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

একখানা ডুলি আনিয়ে ফোশলভাঁকে তাঁর কারখানা-বাড়ীর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হল। পরদিন ফোশলভাঁ মাদ্‌লেনের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল, তাতে লেখা:

'ভাই, তোমার ঘোড়াটি মরে গেছে, আর গাড়িখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তাই তার মূল্য হিসেবে তোমাকে কিছু অর্থ পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুশি হব। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, এই কামনাই রইল। ইতি—

মাদ্‌লেন'

দিন কয়েকের মধ্যেই ফোশলভাঁ সেরে উঠল, কিন্তু একখানি পা কিছুতেই আর স্বাভাবিক হল না।

ফাদার মাদ্‌লেন প্যারিসের সাঁৎ আঁতোয়ান পল্লীর একটি আশ্রমে তাকে মালীর কাজ জুটিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর থেকেই মাদ্‌লেন সম্বন্ধে জাভেয়রের মনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তখন মেয়রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাই মাথা নিচু করেই সে মেয়রের আদেশ পালন করতে লাগল। অবশ্য ভিতরে ভিতরে মাদ্‌লেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবার মত প্রমাণাদি সংগ্রহের চেষ্টাও শুরু করে দিল।

মাদ্‌লেনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এম্—শহরের যে সমৃদ্ধি হয় তা সকলেই স্বীকার করবে। দেশের জনসাধারণের উপার্জন যথাযোগ্য না হলে রাজ-সরকারের রাজস্ব আদায়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং রাজস্ব আদায়ের জন্যে সরকারের ব্যয়বাহুল্য হতে বাধ্য। কিন্তু লোকজন যদি সকলেই কাজ-কর্ম পায়, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালভাবে চলে, তা হলে সরকারের বিশেষ কোন অসুবিধাই হয় না। মাদ্‌লেন এ শহরে বাস করছেন সাত বছর, তার আগে এখানকার রাজস্ব আদায়ে যে টাকা খরচ হত এখন তার চার ভাগের একভাগ মাত্র ব্যয়িত হয়। রাজস্ব সচিব এ সত্যটা স্পষ্ট ভাষায়ই তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। এবং মাদ্‌লেনকে অসংখ্য সাধুবাদ জানিয়েছেন।

নয়

শেষ পর্যন্ত ইন্সপেক্টর জাভেয়ার তার মতলব হাসিল করল। সম্মানিত মেয়রের পরিচয় সংগ্রহ করে সে প্রমাণ করে দিল যে, এ লোক বিখ্যাত দাগী কয়েদী এবং নামকরা দস্যু জঁা ভাল্‌জঁা।

১৮২৩ সালের ২৫ জুলাই তারিখের খবরের কাগজে যে খবরটি প্রকাশিত হল সেটি এই :

> 'এম্—শহরে সম্প্রতি এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। সাত বছর আগে মঁসিয়ো মাদ্‌লেন নামে একজন লোক ওই শহরে এসে নকল চুনির কারবার শুরু করে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেখতে দেখতে ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে। ওই ব্যবসায়ে শুধু যে সে-ই বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছে, তাই নয়, ওই প্রদেশও অর্থশালী হয়েছে। সে ব্যক্তি শহরের ও জেলার সর্বত্র জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। তার এই সব সদনুষ্ঠানের জন্যে স্বয়ং সম্রাট খুশি হয়ে তাকে মেয়রের সম্মানিত পদে নিয়োগ করেন। পুলিস সম্প্রতি সন্ধান নিয়ে মঁসিয়ো মাদ্‌লেনের পূর্ব-পরিচয় সংগ্রহ করেছে। তাতে জানা গিয়েছে যে এ ব্যক্তির নাম জঁা ভাল্‌জঁা এবং সে ১৭৯৬ সালে চুরির দায়ে দীর্ঘকালের জন্যে শাস্তি ভোগ করে।
>
> কারামুক্ত হওয়ার পর পুনরায় চুরি করায় আবার সে দণ্ডিত হয়েছে। ব্যবসায়ে সদুপায়ে প্রায় পাঁচ লক্ষের উপর সঞ্চয় করেছিল, ওই টাকাটা সে লাফিতির ব্যাঙ্কে

মজুত রাখে। গ্রেফ্‌তারের অব্যবহিত আগে সমস্ত টাকাই সে ব্যাঙ্ক থেকে সুকৌশলে তুলে নেয়। এই টাকাটা যে সে কি করল তা জানবার জন্যে বহু চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কোনমতেই তা জানা সম্ভব হয় নি।'

ওই তারিখেরই আর একখানা কাগজে এই খবরটিই আরও ফলাও হয়ে প্রকাশিত হয়।

'জঁা ভাল্‌জঁা নামে এক ব্যক্তি পূর্বে চুরির অপরাধে বহুকাল কারাদণ্ড ভোগ করে বছর সাত-আট আগে মুক্তি পায়। সম্প্রতি তাকে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছে। পুলিস সতর্ক থাকলেও সে এমনি ভাবে সরে পড়ে যে, তার আর কোনই সন্ধান মেলে নি। সে নিজের নাম গোপন করে উত্তর প্রদেশের এক ক্ষুদ্র শহরের মেয়রের পদ যোগাড় করে। তার চেষ্টায় ওই শহর বাণিজ্যের একটি বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। উকিল-সরকারের অক্লান্ত চেষ্টায় তার আসল পরিচয় প্রকাশ পায় ও তাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। লোকটি ভীষণ বলশালী। সে পলায়ন করে। কিন্তু তিন-চার দিন পরেই পুলিস তাকে পুনরায় প্যারিসে গ্রেফ্‌তার করে। প্যারিস থেকে যে সব ছোট গাড়ি গ্রামাঞ্চলে যায়, তারই একখানিতে সে ওই সময় উঠতে যাচ্ছিল। পলায়নের পর ও পুনরায় গ্রেফ্‌তার হওয়ার পূর্বে যে তিন-চারি দিন গত হয়, তারই মধ্যে সে ব্যাঙ্ক থেকে গচ্ছিত প্রচুর অর্থ তুলে নেয়। যে টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছে তার পরিমাণ অনুমান ছয়-সাত লক্ষ ফ্রাঙ্ক। এই টাকা কোথায় লুকিয়েছে তা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই সে টাকার কোনও

সন্ধান মিলছে না। তার বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে যে অভিযোগ গঠিত হয়, তাতে এরূপ উল্লেখ আছে যে, ওই ব্যক্তি আট বছর আগে রাজপথে একটি শিশুর কাছ থেকে বলপূর্বক কিছু অর্থ অপহরণ করে। এই অপরাধের বিচারের জন্যে তাকে দায়রা আদালতে হাজির করা হয়। লোকটি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা করে নি। উকিল-সরকার নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিপন্ন করেন যে, জাঁ ভাল্‌জাঁ দক্ষিণাঞ্চলের ডাকাত দলের একজন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সে কোন আপীল করেনি। তবে রাজা তাকে দয়াপরবশ হয়ে প্রাণদণ্ডের বদলে সারা জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন। তাকে টুলোঁর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ভাল্‌জাঁ যখন মঁসিয়ো মাদ্‌লেন-রূপে এম্‌—শহরে ছিল তখন সে নিয়মিত গীর্জায় গিয়ে উপাসনায় যোগ দিত। কোন কোন কাগজ মন্তব্য করল যে, ধর্মযাজকদের চেষ্টায়ই তার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের বিধান হয়।

সে যাই হোক, মাদ্‌লেনের সঙ্গে সঙ্গেই এম্‌—শহরের সমৃদ্ধি দেখতে দেখতে কর্পূরের মত উবে গেল। তিনি-ই যেন ছিলেন শহরের জান, তাই তাঁর অভাবে শহর শ্রীহীন হতে বাধ্য হল। মাদ্‌লেনের বৃহৎ কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর বাড়ী-ঘর সব ভেঙে পড়তে লাগল, যারা তাঁর কারখানায় কাজ করত, তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ দেশ ছেড়ে গেল, কেউ কাজ ছেড়ে দিল। আগে যা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত, এখন তাই সামান্য পরিমাণে হতে লাগল। যা সাধারণের মঙ্গলের জন্যে হত, তা এখন ব্যক্তিগত লোভের পাঁকে ডুবে গেল। কেন্দ্রে কেউ রইল না, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা

চলতে লাগল। মাদ্‌লেন সকলের মাথার উপর থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নিজের নিজের দিকে টানতে লাগল। যে কাজ এত দিন সকলে একযোগে করেছে এখন সেখানে বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যেখানে ছিল সম্প্রীতি সেখানে বিদ্বেষের রাজত্ব শুরু হল। যিনি ছিলেন ওই ব্যবসার প্রবর্তক, সকলের কল্যাণ ছিল তাঁর কাম্য, এখন একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। মাদ্‌লেনের হাতের সুতা ক্রমশ জট পাকিয়ে উঠতে লাগল। যে প্রণালীতে কাজ হত, তাতে গলদ দেখা দিল। ফলে জিনিস যা তৈরি হতে লাগল তা অত্যন্ত বাজে। লোকের বিশ্বাস নষ্ট হল, খরিদদার না থাকায় জিনিসের কাটতি কমে গেল, মজুরি কম করতে হল, কারখানার কাজ বন্ধ হল, ব্যবসাদারেরা নিজ নিজ ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হল। তখন আর গরিবদের সাহায্যের জন্যে কিছু অবশিষ্ট রইল না, সব ফুরাল।

রাজপুরুষেরাও বুঝতে পারলেন কোথায় ফাটল ধরেছে। দায়রা আদালতে জাঁ ভাল্‌জাঁ ও মাদ্‌লেন একই লোক সাব্যস্ত হয়ে মাদ্‌লেন কারারুদ্ধ হলে চার বছরের মধ্যে ওই প্রদেশের রাজকর আদায় করতে দ্বিগুণ ব্যয় বেড়ে গেল। রাজস্বসচিব ১৮২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর বক্তৃতায় এ বিষয় উল্লেখ করলেন।

দশ

১৮২৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি।

তুলোঁর বন্দরে একখানা অতি জীর্ণ যুদ্ধ জাহাজ এসে নোঙর করল। সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে জাহাজখানা ছিন্নভিন্ন হতে হতে কোনমতে এসে নোঙর করেছে। এখানে মেরামত করা হবে।

নতুন কোন জাহাজ এসে ঘাটে বাঁধলেই শহরের যত নিষ্কর্মা অলস লোকের কাজ জুটে যায়, বিশেষত, ঝড়ের মুখে পড়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে যে যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌছাল, তার সম্বন্ধে ওই সব লোকের কৌতূহল আরও অনেক বেশি। সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পোস্তায় তাদের ভিড় দেখে কে! হাজার রকম সম্ভব অসম্ভব তথ্য তারা নিজেদের কল্পনায় গড়ে তুলে প্রচার করতে শুরু করে দিল।

সে দিন প্রাতঃকালে একটা কাণ্ড ঘটল। খালাসীরা পাল তুলতে ব্যস্ত ছিল। মাস্তুলের শেষ প্রান্তে উঠে দড়ি বাঁধতে গিয়ে পা-হড়কে একটি খালাসী নিচে পড়ে গেল। নিচে পড়ে গেল—কথাটা হয় ত ঠিক হল না, বরং নিচে পড়তে পড়তে মাঝ পথে একটা দড়ি ধরবার সুযোগ পেয়ে সে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলতে লাগল বলাই সঙ্গত হবে। মাস্তুলের মাচানের সঙ্গে দড়িটি পালের একটা তেড়চা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল। ওখান থেকে পড়লে গভীর অতল স্পর্শী সাগরের বুকে তলিয়ে যেতে হবে।

সকলেই হায় হায় করে উঠল, কিন্তু কেউ হতভাগ্য খালাসীটাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এল না। আর আসাও ত মুখের কথা নয়, নিজের জীবন বিপন্ন করতে সাধারণত বড় একটা কেউ চায় না।

বেচারী খালাসীটার শোচনীয় অবস্থা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। আতঙ্কে ভয়ে সে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর দড়িটা এমনি তুলছিল যে, সে নড়া চড়া করতেও সাহস পাচ্ছিল না, পাছে সেটা দৈবাৎ ছিঁড়ে যায়!

কিন্তু ওই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় আর কতক্ষণই-বা ঝোলা যায়! হাত-পা, সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, মুখে চোখে একটা ভীষণ আতঙ্কের ছায়া পড়েছে, মুখে তার রা নেই। আতঙ্কে ভয়ে ডাঙার লোকগুলি তার দিকে তাকাতেও পারছিল না। একটা জীবন্ত লোক তাদের চোখের সামনে অমনি অপঘাত মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় তাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই তারা স্থির করতে পারছে না, অথচ লোকটার এভাবে সলিল সমাধিও ত চোখে দেখা যায় না।

এমন সময় দেখা গেল, কাঠ-বেরালির মত ক্ষিপ্রগতিতে একটা লোক মাচানের উপর উঠে যাচ্ছে। লোকটির গায়ে লাল পোষাক, অতএব সে যে কয়েদী তাতে সন্দেহ নেই। মাথায় তার নীল রঙের টুপি, কাজেই সে যে যাবজ্জীবন কারাবাসেরই আদেশ পেয়েছে তাও বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। লোকটা মাচানের উপর গিয়ে উঠল। হঠাৎ বাতাসে তার মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন দেখা গেল, তার মাথার চুল সাদা ধব্‌ধবে। কাজেই বুঝতে কারুরই কষ্ট হল না যে সে যুবক নয়, প্রৌঢ়।

এই কয়েদীটি পাশের জাহাজে আসছিল। ব্যাপারটা দেখে সে ছুটে গিয়ে কাপ্তানের কাছে বলল, 'আমাকে যদি হুকুম দেন ত আমি লোকটাকে বাঁচাতে পারি।'

কাপ্তান তখন কি একটা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কয়েদী এক লাফে কামরার বাইরে এসে একটা হাতুড়ি দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে এক ঘা মারতেই পায়ের শিকল খান্ খান্ হয়ে ভেঙে গেল। একটা মজবুত লম্বা দড়ি নিয়ে সে তীরবেগে গিয়ে মাচানের উপর উঠল। কত সহজে যে সে পায়ের বেড়ি ভাঙল তা কেউ জানল না, দেখলও না।

উপরে উঠে একবার ভাল করে চারদিক চেয়ে দেখে নিল। মুহূর্ত কাল যেন এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। কয়েদী একবার উপরের দিকে, আর একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর মাচানের একপ্রান্তে দড়ি গাছটির একপ্রান্ত বেশ শক্ত করে বেঁধে দড়িটি নিচে ঝুলিয়ে দিল। এবং চক্ষের পলকে সেই দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

ডাঙার লোকগুলোর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। এতক্ষণ ছিল একজন, এখন দেখা গেল, আর একজন এসে তার জুড়িদার হল। মাকড়শা যেমন করে পতঙ্গকে ধরে তেমনি করে সে নিচে নেমে এল। তবে মাকড়শা ধায় পতঙ্গকে উদরস্থ করবার জন্তে, আর এ ক্ষেত্রে পতঙ্গকে নিশ্চিত মরণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্তে।

খালাসীটা আর ঝুলে থাকতে পারছে না। মুহূর্ত বাদেই হয় ত তাকে হাত ছেড়ে দিয়ে সাগরের গভীর অতলে তলিয়ে যেতে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েদীটা ঝুলতে ঝুলতে নিচে নেমে এসে এক হাতে দড়ি ধরে আর এক হাতে খালাসীটাকে বগলদাবা করে ফেলল। খালাসীটিও তাকে আঁকড়ে ধরল, তখন কয়েদী অনায়াসে আবার দড়ি বেয়ে মাচানের উপর গিয়ে উঠল। খানিক ক্ষণ তুজনে সেখানে বিশ্রাম করে পরে নিচে তার সহকর্মীদের কাছে তাকে পৌছে দিল।

উৎসুক জনতা চীৎকার করে আনন্দোল্লাস জ্ঞাপন করল। তারা চেঁচিয়ে বলাবলি করতে লাগল; 'এই কয়েদীকে এক্ষুনি খালাস করে দেওয়া উচিত!'

কয়েদী দেখল তার কাজ হয়ে গেছে, এবার তাকে নিজের কাজে ফিরে যেতে হবে। জাহাজের লোকগুলি কয়েদীর দিকে সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চলতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়েই হোক, কি মাথা ঘুরেই হোক, লোকে দেখল, কয়েদী চঞ্চল হয়ে হেলে পড়েছে। সহসা, কয়েদী সমুদ্রের জলে পড়ে গেল !

ডাঙার লোকগুলি সমস্বরে 'গেল গেল' করে চেঁচিয়ে উঠল।

কয়েদী যেখানটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেখানটা নোঙর-করা জাহাজ দুখানার মধ্যেকার ফাঁকা জায়গা, কাজেই সে যে আর উঠতে পারবে না সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই একখানা জাহাজী ডিঙি নিয়ে চারজন খালাসী তখনই জলে নেমে গেল, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। লোকটি একবারও জলের উপর ভেসে উঠল না, আর সেই কারণে তাকে ধরাও গেল না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলল, কিন্তু কয়েদীর দেহ মিলল না।

পরদিন তুলোঁর একখানা সংবাদ-পত্রে এই ঘটনার যে খবর প্রকাশিত হল, তা এই :

> 'গতকল্য একজন কয়েদী জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে যায়। প্রথমে সে একজন খালাসীকে আশ্চর্য রকমে রক্ষা করে, পরে নিজে টাল সামলাতে না পেরে সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যায়। তাকে রক্ষা করবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তার মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নি। লোকটির নাম জাঁ ভাল্‌জাঁ, সে ৯৪৩০ নম্বরের কয়েদী। আমরা তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্যে তার স্বজনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।'

এগার

সংবাদপত্রে জাঁ ভাল্‌জাঁর অপমৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হলেও আসলে সে-যাত্রা তিনি মরেন নি।

১৮২৩ সালের শেষাশেষি তিনি প্যারিসের জনবিরল শহরতলির একটি বাড়িতে বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে তার আট বছর বয়সের একটি অনাথা বালিকা, নাম তার কোজেৎ। বালিকাটি এক হতভাগিনীর কন্যা, এক সময় সে ছিল মঁসিয়ো মাদলেনের বিশেষ স্নেহের পাত্রী এবং মৃত্যুশয্যায় নিরাশ্রয় অনাথা মেয়েটিকে তার মুরুব্বির হাতে সঁপে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

চারদিক দেখে শুনে বেশ বুদ্ধি খরচ করেই ভাল্‌জাঁ তাঁর নতুন আশ্রয়স্থানটি নির্বাচন করে নিয়েছেন। এখানে তাঁর এতটুকু ভয়ের আশঙ্কা নেই। শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তার জনস্রোত তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়, বাড়ীর সম্মুখেই একটি নাতিবৃহৎ পার্ক, লোকজন সেখানে বেড়ায়, হাসে, গল্প করে। আর এ-ঘরটি সমগ্র বাড়ীটির মধ্যে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। কাজেই প্রতিবেশীদের মনে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলের কোন কারণই ছিল না। নিচের তলার ঘরগুলি ছোট ছোট, চালাঘরের মত, অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে। এ ঘরগুলিতে অতি গরিব মজুর-শ্রেণীর লোকেরাই বাস করে এবং দোতলার সঙ্গে নিচের তলার কোন সম্বন্ধ নেই। দোতলায় খানকয়েক ভাল ঘর আছে, আর সবগুলো ঘর নয়, ছোট ছোট কুঠরি মাত্র। ভাল্‌জাঁর ঝি এই সব কুঠরির একটিতে বাস করে। এ বাড়ীর ভাড়াটেদের মধ্যে এই বুড়ীঝিটার প্রতিপত্তি অনেক, আসলে সে-ই বাড়ীর দারোয়ান;

কাজেই বিনাভাড়ায় বাস করবার অধিকার পাওয়ায় মালিকের পক্ষ টেনে চলা তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভাল্‌জাঁ যখন ঘরভাড়া নেন, তখন বুড়ী ঝিকে বলেন যে, কোম্পানীর কাগজের সামান্য সুদ থেকে তাঁদের গরিবানা ভাবে চলে। ছয় মাসের ঘরভাড়ার টাকা তিনি আগাম জমা দিয়েছেন এবং ঘরের খবরদারি করবার ভারও তার উপরেই ন্যাস্ত করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

তিনি যখন সমুদ্রে পড়ে যান, আসলে তিনি যখন ইচ্ছা করেই জলে পড়ে যান, তখন তাঁর পায়ে লোহার শিকল ছিল না। তিনি ডুব-সাঁতার দিতে থাকেন। একখানা জাহাজ নোঙর ফেলে ছিল, তার সঙ্গে একখানি ডিঙি বাঁধা ছিল। তিনি সাঁতার দিয়ে গিয়ে ওই জাহাজের কাছে পৌছান ও রাত্রি না আসা পর্যন্ত কোন রকমে আত্মগোপন করে থাকেন। রাত্রির অন্ধকায়ে পুনরায় সাঁতার কেটে কিছু দূর গিয়ে ডাঙায় উঠলেন। টাকা পয়সার অভাব তাঁর ছিল না। কাজেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে জামা কাপড় কিনে ফেললেন।

অনেক ঘোরাফেরার পর তিনি একটা আশ্রয় খুঁজে পেলেন। তিনি মরে গেছেন, খবরের কাগজে এ-সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে স্বস্তিলাভ করলেন—যেন তিনি প্রকৃতই মরে গেছেন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, ভাল্‌জাঁ ও কোজেৎ বড় সুখেই দিন কাটান। ভাল করে ভোর না হতেই কোজেৎ-এর ঘুম ভাঙে, আর সে কত রকম গল্প, হাসি, গান দিয়ে বুড়ো ভাল্‌জাঁকে সজীব করে তুলতে চায়।

ভাল্‌জাঁ কোজেৎকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করে দিলেন, কেন না, মেয়ের বয়স হতে চলল, মূর্খ করে রাখলে ত চলবে না। যিনি আজন্ম কয়েদী, তাঁর মনেও সময় সময় ভাল ভাব, ভাল আদর্শ উঁকি মারে, কিন্তু ভাগ্যদেবতা যাঁকে নিয়ে নির্মম ভাবে ছিনিমিনি খেলছে,

তাঁর চিত্তে সাধু সংকল্প কায়েম হওয়ার সুযোগ পায় না। তিনি প্রাণপণে তাঁর বিগত জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কোজেৎকে লেখাপড়া শেখানো, আর তার সঙ্গে খেলাধুলায় মেতে ওঠা—এ দুটি কাজই এখন ভাল্‌জ্যঁার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে দেখা দিল। কোজেৎ তাঁকে বাবা বলেই জানে এবং তাঁর যে আর কোন পরিচয় আছে বা থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। কোজেৎ আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে পুতুলকে জামাকাপড় পরায়, বুড়ো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ বিস্ময়ে সে দিকে তাকিয়ে থাকেন। আপন মনেই সে পুতুলের সঙ্গে কথা বলে, জবাব দেয়, তিনি কান পেতে সে সব শোনেন। জীবনের যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে এখন তিনি তা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন। মানুষের মধ্যে যে সাধু ও ভাললোক আছে, এখন আর এ কথা তাঁর কাছে মিথ্যে নয়। এখন আর তিনি মনে মনেও কাউকে দোষ দেন না। এখন তাঁর বেঁচে থাকার আগ্রহ উদগ্র হয়েই দেখা দিয়েছে। আজ তিনি বাঁচতেই চান। জীবনের সায়াহ্নে তিনি মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছেন,—কোজেৎ তাঁকে সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

দিনের বেলায় তিনি ঘরের বার হন না, পাছে কেউ তাঁকে দেখে চিনে ফেলে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দু-এক ঘণ্টার জন্যে একাকী বেড়াতে বের হন, কোন কোন দিন কোজেৎও তাঁর সঙ্গে যায়। এবং যে রাস্তায় লোক চলাচল কম, আলোর উপদ্রব কম, সেই সব রাস্তায়ই তিনি বেড়ান। গীর্জায় গিয়ে রাত্রিতে উপাসনা করেন। যে দিন একা বের হন, সে দিন কোজেৎ বুড়ী ঝিয়ের হেপাজতে ঘরে থাকে, কিন্তু বাবার সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ পেলে সে ভারি খুশি হয়। রাস্তায় বের হলেই কোজেৎ-এর প্রাণে ফুর্তি আসে, সে নানা প্রশ্নে বৃদ্ধকে এক মুহূর্তের জন্যও আর কিছু ভাবতে দেয় না।

বুড়ী ঝি ঘরদরজা পরিষ্কার রাখে, রান্নাবান্না করে, জিনিস-পত্র কেনাকাটি করে। তাঁদের চাল-চলনে খাওয়া-পরায় এতটুকু আড়ম্বর নেই। লোকে তাঁদের গরিব বলেই জানে। প্রথম দিন তাঁদের ঘরে যে আসবাব ছিল আজও তাই রয়ে গেছে, একটুও অদলবদল করার প্রয়োজন হয় নি। ভাল্‌জাঁ যখন রাস্তায় বের হন, তখন তাঁর চাল-চলন ও সাজ-পোশাক দেখলে লোকে তাঁকে সাধারণ গরিব মজুর বলেই মনে করে।

এক এক সময় তিনি যখন রাস্তায় বের হন তখন পথে কোন দায়বতী মহিলা তাঁকে ভিখারী মনে করে এক-আধ পয়সা খয়রাত করলে তিনি প্রসন্ন মনে মাথা নিচু করেই সে দান গ্রহণ করে থাকেন। আবার এমনও হয়েছে যে পথ চলতে চলতে তাঁর কাছেও কোন ভিখারী ভিক্ষা চেয়েছে। তিনি তখন চারদিক একবার বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে চট্ করে ভিখারীর সামনে গিয়ে একটা-ছুটা পয়সা, কাউকে বা এক আনা, ছু আনা, চার আনা পর্যন্ত দিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই পিছন না ফিরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে যান।

এতে একটু মুশকিল হল, কেন না, আস্তে আস্তে লোকে জেনে ফেলল যে, তিনি নিজে গরিব হলেও সময় সময় আবার তিনিও ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়ে থাকেন।

বুড়ী ঝি কাউকেই সুনজরে দেখত না, সকলের উপরে সব সময়ই তার একটা হিংসা, দ্বেষ ও সন্দেহের ভাব ছিল অথচ ভাল্‌জাঁ কিন্তু সে কথা জানতে পারেন নি। বুড়ী কানে ভাল শুনতে পায় না, আর সারা দিনরাতই বিড় বিড় করা তার স্বভাব। সব কয়টি দাঁতই তার পড়ে গেছে, কেবল সামনেকার উপর নিচের ছুটি তখনও মায়া ছাড়তে পারে নি, তবে এমন ভাবে নড়বড় করে, কখন যে পড়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। দিনরাত সে ওই ছুটি নড়বড়ে দাঁতেই কিড়মিড় করতে থাকে।

একদিন ভাল্‌জাঁ পাশের একটা খালি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তাই দেখেই বুড়ীর মনে কৌতূহল জাগল। ভাল্‌জাঁ যে কখনও অমন সময় ওরকম স্যাঁৎসেঁতে ঘরে কেন গেলেন, বুড়ী তার কারণ অনুধাবনও করতে পরল না, তাই ব্যাপারটা কি, জানবার জন্যে সে গোপনে তাঁর অনুসরণ করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে উঁকি মেরে দাঁড়াল যেখান থেকে সে ঘরের মধ্যে ভাল্‌জাঁ কি করেন না করেন—সবই দেখতে পাবে, অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না। ভাল্‌জাঁ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু তিনি কি করছেন ফাটল দিয়ে যে কেউ তা দেখতে পারে—এ খেয়াল তাঁর হয় নি।

ভাল্‌জাঁ কাঁচির সাহায্যে তাঁর কোটের আস্তরের একটা বিশেষ জায়গার সেলাই খুলে ফেললেন এবং ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একতাড়া কাগজ বের করলেন। সেই কাগজের তাড়াটি থেকে একখানি রেখে বাকিটা পুনরায় সযত্নে যথাস্থানে রেখে ছুঁচ-সুতা দিয়ে সেলাই করে রাখলেন। বুড়ী স্পষ্ট দেখতে পেল, কাগজখানা আর কিছুই নয়,—একশ' টাকার একখানি নোট! বুড়ীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে আর তখন সেখানে দাঁড়াতে পারল না, একছুটে পালিয়ে গেল।

একটু পরেই জাঁ ভাল্‌জাঁ সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বুড়ীকে ডেকে একশ' টাকার নোটখানা ভাঙিয়ে আনতে অনুরোধ করলেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাটিও জানিয়ে দিলেন যে, কাল কোম্পানির কাগজের ছ'মাসের সুদের টাকা পেয়েছেন।

বুড়ী আপন মনেই বলাবলি করল, কাল সারাদিন ত কই উনি ঘরের বার হন নি, ছটার পর যখন বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন, তখন ত ব্যাঙ্ক খোলা থাকে না, তা হলে কেমন করে টাকা পেলেন?

বুড়ী নোটখানা নিয়ে ভাঙাতে বার হয়ে গেল।

এরই দিন কয়েক পরে ভাল্‌জাঁ এক দিন কি একটা কাজে বাইরে

ব্যস্ত ছিল, কোজেৎও বাবার সঙ্গেই ছিল, বুড়ী ঝি তখন ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত ছিল। একটা লোহার পেরেকে বুড়োর কোটটি ঝুলান রয়েছে। বুড়ীর মনে অদম্য কৌতূহল দেখা দিল, সে কোটটাকে একবার নেড়ে চেড়ে পরখ করে দেখল। তাতে নেই হেন জিনিস কিছুই নেই,—ছুঁচ, সুতা, কাঁচি, এক বাণ্ডিল কাগজপত্র, বড় ছুরি একখানা এবং নানা রকমের ও নানা রঙের পরচুলও অনেকগুলি। তা ছাড়া, কোটের কাপড় ও অস্তরের কাপড়ের মাঝে মুখ সেলাই করা একটি পকেট, তার মধ্যে একতাড়া কাগজ, এও কি ব্যাঙ্কনোট!

এমনি করে দেখতে দেখতে তাঁদের ছয় মাস কেটে গেল।

—— ——

বার

ভাল্‌জাঁ যে পল্লীতে বাসা নিয়েছিলেন তার সামনেই একটা গির্জা ছিল, আর গির্জার সামনে ছিল একটা কুয়ো। ওই কুয়োর জল খারাপ হয়ে যাওয়ায় কর্পোরেশন থেকে ওই জল ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। এই কুয়োর ধারে রোজই সন্ধ্যাবেলা একটা ভিক্ষুক বসে ভিক্ষে করত। ভাল্‌জাঁ মাঝে মধ্যে প্রায়ই ওখান দিয়ে আসতে যেতে ভিখারীকে কিছু কিছু না দিয়ে কখনও সে পথ দিয়ে চলতেন না। কখনও কখনও বা তার সঙ্গে দু-চারটি কথাও কইতেন। অনেকেই বলে যে, ওই ভিখারীটা পুলিসের চর। লোকটা আগে ওই গির্জায়ই কাজ করত, এখন তার বয়স প্রায় পঁচাত্তর বছর। সে সারাক্ষণই ওখানে বসে মালা জপ করে।

একদিন সন্ধ্যার পর জাঁ ভাল্‌জাঁ ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে দিন কিন্তু কোজেৎ তাঁর সঙ্গে ছিল না। তিনি দেখলেন, বুড়ো ভিখারী লণ্ঠনটি সামনে রেখে মাথা নিচু করে বসে আছে। মনে হল, অন্যান্য দিনের মত আজও সে মালা জপ করছে। ভাল্‌জাঁ তার কাছে গিয়ে অভ্যাসবশে তার হাতে কিছু দিলেন। ভিক্ষুক হঠাৎ চোখ মেলে ভাঁল্‌জার দিকে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার মাথা নিচু হল। ব্যাপারটা ঘটে গেল পলকের মধ্যে। জাঁ ভাল্‌জাঁর বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। তাঁর মনে হল যে, লণ্ঠনের আলোকে তিনি যে মুখখানা দেখতে পেলেন তা তাঁর চেনা ভিক্ষুকের মুখ নয়, সে মুখ শান্ত ও উজ্জ্বল; কিন্তু এ মুখ তাঁর পরিচিত, এ মুখ দেখে ভয় পেতে হয়। অন্ধকারে পথ চলতে

চলতে সামনে একটা বাঘ দেখলে পথিকের মন যে রকম আঁতকে ওঠে, সে মুখ দেখে ভাল্‌জাঁর মনেও সে রকম হল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি না পারলেন পিছিয়ে যেতে, না পারলেন নিঃশ্বাস ফেলতে, —হাঁ করে ভিখারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ দিকে ভিখারী মাথা নিচু করে রয়েছে, ভাল্‌জাঁও আর যেন সেখানে নেই এমনি মনে হল।

ঠিক এই সময় ভাল্‌জাঁর মনে হল, বাঁচতে হলে একটি কথাও বলা উচিত হবে না। ভিখারীর সেই একই অবস্থা, একই সাজ, রোজ যেমন তাঁর দিকে তাকায় আজও তেমনি। ভাল্‌জা আপন মনেই বলে উঠলেন, 'দূর ছাই, আমি পাগল হলাম নাকি, এ অসম্ভব!'

তিনি আর বেড়াতে গেলেন না, ঘরে ফিরে এলেন। মন থেকে কিন্তু ভাবনাটা গেল না। মন বলছে, যে মুখ তাঁর চেনা-চেনা মনে হল সে কি তাঁর পরম শত্রু ইন্সপেক্টর জাভেয়রের নয়!

তিনি আর ভাবতেও চাইলেন না।

ভিখারীকে কিছু বললেনও না, ভিক্ষাও দিলেন না, চলে এলেন। এজন্যে তাঁর দুঃখ হল। কেন না, বেচারি দু-দুবার মাথা তুলে তাঁর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায়ও তিনি আবার বার হলেন। ভিখারীও নিজের জায়গায় বসে আছে। ভাল্‌জাঁ তার সামনে গিয়ে বললেন, 'খবর কি হে? কেমন আছ?' বলেই তিনি তাকে একটি আনি দিলেন।

ভিখারী হাত পেতে আনিটি নিয়ে ভাল্‌জাঁর মুখের পানে কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

না, তাঁরই ভুল। এ নিশ্চয়ই সেই চৌকিদার-ভিখারীটা। ভালজাঁর মনে আর এতটুকু সংশয়ও রইল না। আপন মনে হেসে

তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন, একে আমি জাভেয়র মনে করেছি! পাগলামি আর কাকে বলে! হয় আমার চোখের জোর কমে গেছে, নয় ত মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

তারপর কটা দিন কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যা আটটার সময় তিনি কোজেৎকে বানান শেখাচ্ছিলেন, এমন সময় সহসা সদর দরজা খোলার শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা বন্ধ হয়েও গেল।

ব্যাপারটা তাঁর কাছে কেমন যেন ভাল লাগল না। বিশেষত, বুড়ী আর তিনি ছাড়া বাড়ীতে তখন আর কেউ ভাড়াটে ছিল না, আর বুড়ী খরচ বাঁচানোর অজুহাতে সন্ধ্যা হতে না হতেই শুয়ে পড়ে। জাঁ ভাল্‌জাঁ কোজেৎকে চুপ করবার ইঙ্গিত করলেন, কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে, জুতার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভাবলেন, হয় ত বুড়ীই আসছে, হয় ত কোন দরকারী কাজে বাইরে গিয়েছিল। ভাল্‌জাঁ কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন।

পায়ের শব্দ খুব ভারী বলেই মনে হল, নিশ্চয়ই পুরুষের চলার শব্দ, বুড়ীরও হতে পারে, ও তলা-পুরু ভারী জুতাই পরে কি-না।

সে যাই হোক, শাস্ত্রে বলে সাবধানের মার নেই, ভাল্‌জাঁ ফুঁ দিয়ে চট্‌ করে বাতিটি নিবিয়ে দিলেন। কোজেৎকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বললেন। তাঁদের দরজার কাছে এসেই পায়ের শব্দটা যেন থেমে গেল, ভাল্‌জাঁ নীরবে দম বন্ধ করে দরজার দিকে পিছন ফিরে কান খাড়া করে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিছুই বোঝা গেল না। শব্দটাও আর শোনা গেল না। পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকালেন। ছিদ্র-পথে বাইরে যেন একটা ছোট্ট আলো দেখা গেল—ঘোর আঁধারে সেই

আলোকটি একটা দুষ্ট-গ্রহের মতই তাঁর মনে হল। কেউ যে দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

এমনি ভাবে মিনিট কয়েক চুপচাপ কেটে গেল। ইতিমধ্যে বাইরের আলোটাও যেন আর দেখা গেল না, অথচ পদশব্দও শোনা গিয়েছিল, তার পদশব্দ ভাল্‌জাঁ শুনতে না পায় তার জন্যে হয়ত সে লোকটা পায়ের জুতা খুলে ফেলেছে।

ভাল্‌জাঁ জামাকাপড় পরেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন, কিন্তু সারা রাত একটি বারও চোখ বুজতে পারলেন না।

সারা রাত ঘুম হয় নি, শ্রান্ত হয়ে রাত্রি শেষে ভাল্‌জাঁর ঘুমের আবেশ হয়েছে। সকাল হয়ে গেছে, পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল এবং গত রাত্রির সেই পায়ের শব্দ—শুনতে পেলেন। চুপি চুপি কবাটের ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, কিন্তু দালানে তখনও বেশ অন্ধকার থাকায় লোকটাকে স্পষ্ট দেখা গেল না। এবারে লোকটা ভাল্‌জাঁর ঘরের সামনে না থেমে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই আলোতে তার মুখখানা ভাল করেই দেখা গেল, লোকটি আকারে লম্বা, গায়ে একটি লম্বা কোট, হাতে মোটা একগাছি লাঠি—অনেকটা ইন্সপেক্টর জাভেয়রের মতই দেখতে। জানলা দিয়ে আর একবার ভাল করে দেখে নেওয়ার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু জানলা খুলতে সাহস পেলেন না—পাছে শব্দ পেয়ে লোকটা তাঁকে দেখে ফেলে।

তাঁর মনে হল, লোকটা চাবি পেল কোথায়? কে তাকে চাবি দিল?

সকাল সাতটার সময় বুড়ী প্রতি দিনকার মত ভাল্‌জাঁর ঘরদরজা পরিষ্কার করতে এল। ভাল্‌জাঁ তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। বুড়ীর কাজে কর্মে কোন

পরিবর্তন লক্ষিত হল না, সে বেশ ভালমানুষের মেয়ের মতই প্রতিদিনকার কাজ করতে লাগল।

ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বুড়ী ভাল্‌জাঁর দিকে চেয়ে বলল, 'রাতে কারুর আসার শব্দ পেয়েছেন, কেমন, তাই না?'

ভাল্‌জাঁ বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'হাঁ, পেয়েছি। কে বল দেখি?'

বুড়ী জবাবে বলল, 'কাল একজন নতুন ভাড়াটে এল কি-না, তাই।'

'কি নাম তার'?

'নামটা ঠিক মনে হচ্ছে না, ডুমঁ, না, ডুমঁ—কি যেন বলেছিল।'

'কি করে?'

বুড়ী একবার ভাল্‌জাঁর দিকে তার খুদে চোখ দুটো দিয়ে মিট মিট করে তাকাল, পরে জবাব দিল, 'আপনার মতই জমানো টাকায় চলে।'

হয়ত বুড়ীর কথাটার মধ্যে কোন কিছুর ইঙ্গিত ছিল না, কিন্তু ভাল্‌জাঁর মনে চট্ করে এর একটা মানে বেরিয়ে পড়ল।

বুড়ী কাজ সেরে চলে যেতেই তিনি দেরাজ খুলে টাকা কড়ি যা-কিছু ছিল সবই একটা গেঁজিয়ার মধ্যে ভরে ফেললেন এবং যাতে শব্দ না হয় সে দিকে তাঁর যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সশব্দে একটা টাকা মেজেতে পড়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই তিনি একবার নিচে রাস্তার দিকে তাকালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তাঁর মনে হল, এ পথ দিয়ে চলা-ফেরা করতে লোকেরা যেন আজ ভুলেই গেছে। হতে পারে কেউ গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন।

ঘরে ঢুকে কোজেৎকে বললেন, 'আয় ত মা।'

কোজেতের হাত ধরে তিনি ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভাল্‌জাঁ রাস্তায় বেরিয়ে বার দুই রাস্তাটা টহল মেরে বেড়ালেন এবং পরে এগিয়ে চললেন। কেউ অনুসরণ করছে কি-না বুঝবার জন্যে এ-গলি সে-গলি দিয়ে যেতে লাগলেন, উদ্দেশ্য, কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে কি-না।

সে দিন পূর্ণিমা তিথি। চারদিক জোৎস্নায় ভরে গেছে। এতে বিপদের আশঙ্কা বেশি বলে জাঁ ভাল্‌জাঁর মনে হল না। চন্দ্র তখনও দিক্‌চক্রবালের কাছেই ছিল, ফলে, পথে অনেকটা জায়গা আলোকিত হয়ে ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেকটা জায়গায় ছায়াও পড়েছিল। যে দিকে ছায়া পড়েছে, পথের সেই পাশ দিয়ে ভাল্‌জাঁ চলতে শুরু করলেন। আর পথের যে ধারটা আলোকিত, সে দিককার লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করেছিলেন। রাস্তার যে দিক অন্ধকার সেদিকের লোকজনের গতিবিধি তিনি যে লক্ষ্য করতে পারছিলেন না, সে কথা বোধ হয় তাঁর মনে ছিল না, তবু তাঁর মনে হল যে, না, কেউ তাঁর পিছু নেয় নি।

কোজেৎ বাবার হাত ধরে নীরবে পথ চলছিল, একটি কথাও বলেনি। অতটুকু মেয়েও যেন নিজেদের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে।

কোজেতের মত ভাল্‌জাঁও জানতেন না যে, তিনি কোথায় চলেছেন। কোজেৎ যেরকম তাঁর উপর নির্ভর করে চলেছে, জাঁ ভাল্‌জাঁও সেরকম ভগবানের উপর নির্ভর করেছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, কোন মহত্তর পুরুষের হাত ধরেই তিনি এগিয়ে চলেছেন, যেন অলক্ষিতে থেকে সেই মহাপুরুষ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। সে যাইহোক, তিনি কোনও বিষয়ে মনঃস্থির করেন নি; কোনও কার্যপ্রণালীও স্থির করেননি; কোথায় চলেছেন, কি করবেন, কিছুই তাঁর ঠিক নেই! যাকে তিনি দেখেছেন সে যে জাভেয়র, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। সে জাভেয়র হতে পারে, কিন্তু সে যে তাঁকে চিনেছে, তাও জোর

করে বলা যায় না। তিনি ভাবলেন, এ ত আমার ছদ্মবেশ, সকলেই জানে আমি মরে গেছি। অথচ কয়েক দিন ধরে পর পর যেসকল ব্যাপার ঘটে আসছে তাতে সন্দেহ অনিবার্য হয়েই দেখা দিল। সেখানে থাকা কোন মতেই উচিত হবে না। তাই আর একটা নিরাপদ জায়গা যোগাড়ের চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে।

তিনি শহরের যে পল্লীর অলিগলি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সে পল্লীর লোকেরা সন্ধ্যার পরই ঘুমিয়ে পড়ে। তিনি তাঁর অনুসরণকারীর চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে সুকৌশলে বিভিন্ন পথে নানা রূপে চলতে লাগলেন। পথিকদের থাকা খাওয়ার মত বহু হোটেল সে পল্লীতে ছিল কিন্তু তার কোনটিও তাঁর মনোমত হল না। তাঁর মনে হল, যদি কেউ তাঁর পিছু নিয়ে থাকে, তা হলে তিনি নিশ্চিত তাদের চোখের আড়ালে এসে পড়েছেন।

রাত তখন এগারটা বেজেছে। তাঁরা কোতয়ালির সামনে দিয়ে গেলেন। খানিক এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে চাইতেই ভাল্‌জাঁ আপিসের আলোয় দেখতে পেলেন, তিন ব্যক্তি তাঁদের দিকেই আসছে। তাঁর মনে হল, তারা হয় ত তাঁদেরই অনুসরণ করছে। ভাল্‌জাঁ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চললেন। সেই তিন ব্যক্তির একজন খানিকটা পথ এসে পুনরায় কোতোয়ালিতে ফিরে গেল এবং আর একজন—যে আগে আগে আসছিল—তাকে দেখে তাঁর মনে দস্তুর মত সন্দেহ হল।

ধাঁ করে তিনি পাশের একটা সরু অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়লেন। সে গলি থেকে পর পর সাত-আটটা গলি ঘুরে এগিয়ে চললেন। এবারে গিয়ে তাঁরা একটা খোলা পার্কের মত জায়গায় পড়লেন।

চারদিক জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকিত। ভাল্‌জাঁ লোকটাকে একবার ভাল করে দেখে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা বাড়ীর

দেউড়িতে ঢুকে পড়লেন। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই অনুসরণকারীরা এসে উপস্থিত হল। তাদের দলে এখন চারজন, সকলের চেহারাই বেশ লম্বা, গাট্টা-গোট্টা ধরনের গায়ে লম্বা কোট, মাথায় গোল টুপি এবং হাতে মোটা মোটা লাঠি। তাদের দেখলে সবারই প্রাণে ভয়ের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া, এই দুপুর রাত্রে তারা যে মতলবে বেরিয়েছে তা যে মোটেই সাধু নয় তা বলাই বেশি। তারা যে ভদ্রবেশি চারজন নিষ্ঠুর দানব-বিশেষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খানিক বাদেই তারা এসে পার্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত, শিকার কোন্ দিকে গেল ইত্যাদি বিষয়েই হয় ত পরামর্শ করতে লাগল। দলপতি আঙুল বাড়িয়ে ভাল্‌জাঁ যে দিকে গেছে সেই দিক দেখিয়ে দিল, কিন্তু আর একজন দিল তার ঠিক বিপরীত দিক দেখিয়ে। আলোচনার পর সম্ভবত দু দলের দু দিকে যাওয়াই স্থির হল। কেন না, দলপতি তার নির্দেশ মত এগিয়ে চলল, অন্য দল তার বিপরীত দিকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাল্‌জাঁ সেই জ্যোৎস্নার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল, দলপতি আর কেউ নয়—স্বয়ং ইন্সপেক্টর জাভেয়র—তাঁর পরমশত্রু! অতঃপর তার মতলব সম্বন্ধে ভাল্‌জাঁর আর কোন সন্দেহই রইল না।

ভাগ্যক্রমে তাঁর অনুসণকারীদের তখনও সন্দেহ ছিল। তারা ইতস্তত করায় ভাল্‌জাঁর কিছুটা সুবিধা হল। তাদের সময় নষ্ট হল। ভাল্‌জাঁ সময় পেলেন। তিনি যে, দেউড়ির আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন, সে আশ্রয় ছেড়ে তাড়াতাড়ি তিনি কোজেৎকে নিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কোজেৎ ছেলেমানুষ, সে আর চলতে পারছিল না। অগত্যা ভাল্‌জাঁ তাকে কাঁধে তুলে নিলেন। রাস্তায় লোকজন নেই। জ্যোৎস্না রাত্রি বলে গলিতে আলো জ্বালা হয় নি। তিনি আরও জোরপায়ে চলতে লাগলেন।

এ-পথ সে-পথ করে অনেকটা পথ হেঁটে তারা নদীর তীরে এসে পড়লেন! লোকজনের চলাচল তখন বন্ধ হয়ে এসেছে, পোস্তা একেবারে খালি। পুল পার হয়ে ওপারে যাওয়াই ঠিক করলেন। সে সময় পুলে পয়সা নেওয়া হত। তিনি একটি পয়সা দিলেন কিন্তু ঘাটওয়াল বললে, 'দু পয়সা লাগবে। যাকে তুমি কাঁধে নিয়ে যাচ্ছ, সে চলতে পারে। কাজেই তার জন্যেও পয়সা লাগবে।'

ভালজাঁ আর একটি পয়সা দিলেন। গোলমাল না করে চলে যাওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি মনে মনে বিরক্ত হলেন।

ঠিক এই সময় একখানি বোঝাই গাড়ী তাঁরই মত পুলের উপর দিয়ে নদীর দক্ষিণ পাড়ে যাচ্ছিল। এতে তাঁর সুবিধা হল। তিনি ঐ গাড়ীর ছায়ায় ছায়ায় পুল পার হতে লাগলেন।

পুলের মাঝখানে গিয়ে কোজেৎ বলে বসল, সে হেঁটে যাবে, কাঁধে চড়ে যেতে সে ভারী অসুবিধা বোধ করছে। তিনি তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে চলতে লাগলেন।

পুল পার হয়ে দেখলেন, তাঁর ডান দিকে কয়েকটা কাঠের গোলা আছে। তিনি সে দিকেই এগিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছতে হলে এরকম খানিকটা জায়গা যেতে হয়, যেখানে কোন ঘরবাড়ী বা গাছপালা নেই, ফলে রাস্তাটা জ্যোৎস্নায় আলোকিত। ওখানে তাঁকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তাঁকে সেখান দিয়েই যেতে হল। তিনি ইতস্তত না করে চলতে লাগলেন। তাঁর মনে হল যে, অনুসরণকারীরা ঠকেছে এবং এখন আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। লোকে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করছে বটে কিন্তু পিছনে আসছে না।

কাঠের গোলাগুলি ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। দুটি গোলার মাঝখান দিয়ে ছিল একটি পথ, পথটি সরু ও অন্ধকার—যেন তাঁর সুবিধার জন্যেই

ওরকমটি তৈরি হয়েছে। গলিতে ঢুকতে গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালেন। সেখান থেকে সমগ্র পুলটা স্পষ্ট দেখা যায়।

দেখতে পেলেন, চারজন লোক পুলের উপর উঠছে, তাদের ছায়া দেখা গেল। তারাও নদীর দক্ষিণ পাড়েই আসছে।

এরাই যে ভাল্‌জাঁর পিছু নিয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ভাল্‌জাঁ ধরা পড়বার আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন।

তাঁর মনে এই আশা হল যে জ্যোৎস্নালোকিত পথটুকু অতিক্রম করবার সময় অনুসরণকারীরা পুলে ওঠেনি, কাজেই তাঁকে দেখতেও পায় নি। কিন্তু তাই বলে ভয় দূর হল না। জাভেয়রকে তিনি বেশ ভাল করেই জানেন, সহজে ছাড়বার পাত্র সে নয়। সে যাই হোক, ইতিমধ্যে তাঁরা অনেকটা এগিয়ে গিয়ে রাত্রির মত আশ্রয় খুঁজে নিতে পারবেন।

কিন্তু ভাল্‌জাঁ ভুল করলেন। গলিটা কানা। একটু এগিয়ে যেতেই সামনে উঁচু দেয়াল তাঁদের গতি রোধ করল। পিছু হটলে শত্রুর হাতে গিয়ে পড়তে হয়, কাজেই যেমন করে হোক, দেয়াল টপকে ওপাশে গিয়ে পড়তেই হবে, তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

কিন্তু অসুবিধা এই, কোজেৎকে নিয়ে দেয়াল টপকাবেন কেমন করে? দেয়ালের গাঁথনি ভাল করে পরখ করতে করতে পকেট থেকে একটি লোহার ছুঁচালো শলা ও একটি ছোট্ট হাতুড়ি বের করলেন এবং দেয়ালে ঠুকে শলাটি অতি সহজে বসিয়ে চাপ দিতেই একখানা ইট খুলে গেল। অমনি করে তার উপরে, তার উপরে—পর পর কয়খানা খুলে সেই গর্তে পা দিয়ে বেয়ে বেয়ে অনায়াসেই উপরে গিয়ে উঠলেন। পায়ের জুতা আগেই ওপাশে ফেলে দিলেন। একটা মোটা দড়ির এক প্রান্ত নিলেন কোজেৎ-এর কোমরে বেঁধে আর এক প্রান্ত নিজের হাতে। এভাবে অতি সহজেই কোজেৎকে টেনে উপরে তুললেন এবং

অপর দিকে নামিয়ে দিয়ে নিজে একটা গাছের ডাল ধরে নিচে নেমে পড়লেন।

ততক্ষণে অনুসরণকারীরা সেই অন্ধকার সরু গলির মধ্যে এসে উপস্থিত হল এবং অনেকক্ষণ সেই নিস্তব্ধ গলিটা পদভরে তোলপাড় করে ফেলল, কিন্তু ভাল্‌জাঁর কোন সন্ধানই মিলল না। দেয়াল টপকাবার সম্ভাবনার কথা তাদের মনেই হল না, কেন না, সেটা অসম্ভব ব্যাপার, আর এত তাড়াতাড়ি তা যে কেমন করে সম্ভব হতে পারে তা জাভেয়রের মত পাকা পুলিস ইন্সপেক্টরের মাথায়ও এল না।

তের

ভাল্‌জঁা দেয়াল থেকে নিচে নেমে একবার চারদিক তাকিয়ে দেখলেন। সেটি বাগান-বাড়ী, বাগানখানি বেশ বড়ই, তবে নিতান্ত অযত্নে আছে। চারদিকে আগাছা জঙ্গলে পূর্ণ। এখানে সেখানে কতকগুলি ফল-ফুলের গাছ, খানিকটা জায়গায় শাক-সবজির চাষ, অদূরে একটি অতি পুরাতন ভাঙ্গা ইঁদারা।

বাগানের একপাশে পুরানো একটা বাড়ী, কতকাল আগে যে তৈরি হয়েছিল কে জানে। এখন প্রকৃতির দয়ার ভিখারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় ফাটল, তাতে ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে। এ-হেন বাড়ীতে যে কেউ বসবাস করে না, করতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে এই বাড়ীর ছাদহীন চত্বরে কোজেৎকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন।

কুয়াশায় বাগানের আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবে অস্পষ্ট ভাবে একটা বাড়ীর মত অদূরে কি যেন দেখা যাচ্ছিল। বাগানে যে অত রাত্তিরে কেউ নেই তা তার চেহারা দেখেই মালুম হয়। কোজেৎ শীতে থর্ থর্ করে কাঁপছিল এবং বাবাকে আঁকড়ে ধরেছিল। ভয়ও যে না হচ্ছিল তা নয়, তবে অতটুকু মেয়ে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ের আশ্রয়ে হাজার রকম দুঃখ-কষ্টে মানুষ হয়েছে। তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না। তা ছাড়া, দেয়ালের অপর পার্শ্বে তখনও ইন্সপেক্টর জাভেয়রের দলের পদধ্বনি ও তাঁদের খুজে না পাওয়ার ব্যর্থ আক্রোশের আভাস পাচ্ছিল। নিজেদের অবস্থাটা সে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। তাই চাঞ্চল্য প্রকাশ করে বিপদ ডেকে আনতে চায় নি।

পুলিসের দল যে সব সরে পড়ল, তাও বোঝা গেল। বাগানের সে নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় তখনকার মত তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

এতক্ষণ তিনি কোজেৎ-এর দিকে নজর দিতে পারেন নি। তাই চুপি চুপি ডাকলেন, 'কোজেৎ!'

কোন জবাব এল না। মেয়েটার হাত-পা সব বরফ ব'নে গেছে।

তবে কি কোজেৎ বেঁচে নেই!

ভাল্‌জাঁ শিউরে উঠলেন।

সহসা সেই নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে মুখরিত করে প্রার্থনা-গান শোনা গেল। বাণী তার অস্পষ্ট, কিন্তু সুর তার স্বর্গীয়। সেই অন্ধকারের বুক চিরে নারীকণ্ঠের সে স্তবগান তাঁকে বিমুগ্ধ করল। কুয়াশার আড়ালে যে বাড়ীখানা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সেখান থেকেই সুর ভেসে আসছে। ভাল্‌জাঁর মনে হল, দানবের অন্তর্ধানের পর এই প্রার্থনা-সঙ্গীত তাঁর সকল ভয় সকল ভাবনাকে দূর করে দিয়ে যেন অভয় দিচ্ছে—ওরে তোর ভয় নেই! তোর ভয় নেই!

ভাল্‌জাঁ তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। গানের সুর যে কোথা থেকে আসছে এবং কিসের গান—তা তাঁরা দু'জনার কেউ বুঝতে পারলেন না। একজন অনুতপ্ত আর একজন নিষ্পাপ, উভয়েরই মনে হল, তাঁদেরও প্রার্থনায় যোগ দেওয়া উচিত। তাঁদের মনে হল, এ প্রার্থনা, এ সঙ্গীত যেন মানুষের সকল দুঃখ ধুয়ে মুছে দেবে।

গান থেমে গেল। কতক্ষণ যে চলেছিল ভাল্‌জাঁ তা বলতে পারেন না। সত্যিকার আনন্দ অনেকক্ষণ ধরে হলেও লোকের মনে হয়, মুহূর্তেই যেন শেষ হয়ে গেল।

আবার সব চুপচাপ। বাগানের কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, রাস্তাঘাট নিঃঝুম। যে বাড়ীর ভিতর থেকে গান ভেসে আসছিল

সে বাড়ীতেও যে লোকজন কেউ আছে তা মনে হল না। তাঁর মনে আর কোন ভয়, কোন ভাবনাই রইল না। বাতাসে শুকনো পাতার মর্মর শব্দ—তাতেও যেন একটা করুণ মিষ্টি সুর।

একটু পরেই বাতাস আরও জোরে বইতে শুরু করল। রাত কত হয়েছে কে জানে। কোজেৎ এতক্ষণ কিছুই বলে নি, নীরবে বাবার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল। তাঁর মনে হল, হয় ত মেয়েটা তাঁর ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আসলে সে ঘুমোয় নি, তবে তার চাউনি থেকে মনে হয় যে, শীতে ও পরিশ্রমে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। সে কাঁপছিল।

কোজেৎকে আদর করে বুড়ো শুধালেন, 'ঘুম পেয়েছে মা ?'

মেয়ে জবাব দিল, 'ভারী শীত করছে বাবা !'

ভাল্‌জাঁ তাড়াতাড়ি নিজের গা থেকে কোটটি খুলে নিয়ে তাই দিয়ে মেয়েকে আপাদমস্তক ঢেকে দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শীত কি এখন একটু কম বোধ হচ্ছে না মা ?'

'হাঁ বাবা।'

'বেশ, একটু অপেক্ষা কর আমি এখনই আসছি।'

আরও একটু ভাল আশ্রয় খুঁজবার জন্যে তিনি সেই ভাঙা বাড়ী থেকে বের হয়ে বড় বাড়ীটার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। সবকয়টি দরজাই ভিতর থেকে বন্ধ। একতলার সবগুলি জানলায়ই গরাদে রয়েছে।

তিনি ফিরে এসে দেখলেন, কোজেৎ একটি পাথরে ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পরিশ্রমে, শীতে, দুশ্চিন্তায় তিনিও অসুস্থ বোধ করছেন।

এমন সময় অদূরে একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। শব্দটা বাগান থেকেই আসছে। খুব জোরে নয়। শব্দ লক্ষ্য করে সেই দিকে

তাকাতেই ভাল্‌জাঁ দেখতে পেলেন, কে একজন বাগানে শাক-সবজি তদারক করে বেড়াচ্ছে।

ভাল্‌জাঁ ভয়ে আঁতকে উঠলেন। বিপদ কি তাঁকে কিছুতেই ছাড়বে না! মানুষকে আর তাঁর বিশ্বাস নেই। এ লোকটি হয় ত তাঁকে দেখতে পেয়ে এখনই 'চোর চোর' করে চেঁচিয়ে উঠবে। বাড়ীর লোকজন সব সমবেত হবে, পুলিস আসবে, গ্রেফতার করে তাঁদের ধরে নিয়ে যাবে।

ভাল্‌জাঁ কোজেৎ-এর শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করলেন—ক্ষীণ, বড় দুর্বল। যে-কোন মুহূর্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেমন করে একটু আগুন পাওয়া যায়, কোজেৎকে একটু উত্তপ্ত করতে না পারলে সে বাঁচবে না।

তিনি সোজা গিয়ে সেই লোকটির পিছনে দাঁড়ালেন। লোকটি নিচু হয়ে কি করছিল, ভাল্‌জাঁর উপস্থিতি টের পায় নি। ভাল্‌জাঁ পকেট থেকে গোটা কয়েক টাকা বের করে তার সামনে ধরে কাকুতি মিনতি করে বলে উঠলেন, 'আপনি কে, জানিনে। আজ রাত্তিরের মত আমাকে আর আমার বালিকা কন্যাকে একটু আশ্রয় দিন। তার বদলে এই টাকা কয়টি দিচ্ছি, আরও চান ত কাল সকালে দেবো।'

এই সময় জ্যোৎস্না এসে ভাল্‌জাঁর মুখখানিকে আলোকিত করে দিল। লোকটি ভাল্‌জাঁকে চিনতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলে উঠল, 'ফাদার মাদলেন! আপনি! আপনি কোথা থেকে?'

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে নিজের পরিত্যক্ত নাম নিতান্ত অচেনা লোকের মুখে উচ্চারিত হতে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে? এ কার বাড়ী?'

'কি আশ্চর্য! ফাদার মাদলেন, আমাকে চিনতে পারছেন না?

আমি ফোশল্‌ভাঁ! আপনি একদিন আমাকে গাড়ির চাকার তলা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, মনে পড়ে না ?'

'ওঃ, তুমি! মনে পড়েছে।,

বুড়া বললে, 'আমার ভাগ্য !'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'তুমি এখানে কি করছ ?'

'কেন, তরমুজ ঢেকে দিচ্ছি—দেখতে ত পাচ্ছেন !'

একটু থেমে সে বলতে লাগল, 'জ্যোৎস্না দেখেই আমার মনে হল যে রাত্রিতে বরফ পড়বে। তাই তরমুজগুলি ঢেকে দিচ্ছিলাম।' পরে ভাল্‌জাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসি মুখে সে বলল, 'আপনিও বোধ হয় এই করতেন। কিন্তু সেকথা যাক, আপনি এখানে এলেন কেমন করে ?'

ভাল্‌জাঁ দেখলেন যে এ বুড়ো তাঁকে মাদলেন বলেই জানে। সুতরাং তাঁকে সাবধানেই কথা কইতে হল। তিনি তাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন ।

'তোমার হাঁটুতে ঘণ্টা বাঁধা কেন ?'

ফোশল্‌ভাঁ বলল, 'তা হলে তাঁরা ঘণ্টার শব্দ শুনে সরে যেতে পারবেন।'

'তাঁরা কারা ?

'এ বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোকেরা থাকেন কি-না, পুরুষ তাঁদের দেখতে নেই।'

'এখানে কারা থাকেন ?'

'কেন, আপিন ত জানেন।'

'আমি কেমন করে জানব ?'

'কেন, এখানে মালীর কাজে আপনিই ত আমাকে মনোনীত করেছিলেন।'

'মনে কর, আমি জানি নে।'

'আচ্ছা, তা হলে বলি, এটি একটি কুমারী-আশ্রম। কিন্তু ফাদার মাদলেন, বলুন ত আপনি কেমন করে এখানে ঢুকলেন? এখানে ত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।'

'তুমি যে রয়েছ?'

'আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

ভাল্‌জাঁ জবাবে বললেন, 'তবু, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

ফোশল্‌ভাঁ বলে উঠল, 'তা কেমন করে হতে পারে? নিয়ম নেই যে।'

তখন জাঁ ভাল্‌জাঁ ফোশল্‌ভাঁর সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকে বললেন, 'ফোশল্‌ভাঁ, ভাই, একদিন তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম, আজ তুমি আমাকে বাঁচাও।'

বৃদ্ধ ফোশল্‌ভাঁ তার লোল কম্পিত হস্তে ভাল্‌জাঁর মজবুত হাত দুখানি ধরে বললে, 'ফাদার মাদ্‌লেন, আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন—জীবন দিয়েও যদি আপনার কোন কাজে আসতে পারি ত নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করব।'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'তোমাকে কি করতে হবে বলছি। তোমার থাকবার জন্যে নিশ্চয় একখানা নির্দিষ্ট ঘর আছে?'

'ওই ভাঙা বাড়ীটার পিছনে একখানি কুঁড়ে আছে। ওইখানেই আমি থাকি। সেখানে কেউ যায় না। ওই কুঁড়েতে তিনখানি কামরা আছে।'

'বেশ। এখন তোমার কাছে আমার দুটি অনুরোধ আছে।'

'ফাদার মাদ্‌লেন, অমন করে বলছেন কেন? আদেশ করুন।'

'ভাল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আমি কেমন করে, কেন এখানে এলাম তা জিজ্ঞাসা করবে না, আমার সম্বন্ধে যা জান তা কাউকে বলবে না, আর আমার সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহলও কখনও প্রকাশ করবে না।'

'বেশ, তাই হবে। আমি নিশ্চয় জানি, আপনি কখনও সৎ ছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন না।'

'তবে আমার সঙ্গে এস। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে আসি।'

সে আর কিছু না বলে ভাল্‌জাঁর পিছনে পিছনে চলল।

কোজেৎকে কোলে করে ফোশল্‌ভাঁর কুটীরে নিয়ে গিয়ে তাকে ফোশল্‌ভাঁর বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে আগুনের তাপে কোজেৎ পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভাল্‌জাঁ তাঁর গলাবন্ধ ও কোট পরলেন। দেয়াল টপকাবার আগে টুপিটা খুলে দেওয়ালের উপর দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন—সেটা কুড়িয়ে আনলেন।

ভালজাঁ যখন কোট পরছিলেন তখন ফোশল্‌ভাঁ পায়ে বাঁধা ঘণ্টাটা খুলে ফেলে দেওয়ালের একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল।

বহু কাল পরে এক অপ্রত্যাশিতভাবে জীবন-রক্ষকের দেখা পেয়ে কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ আনন্দে আটখানা হল। পানভোজনে ও গল্প করে তারা অনেক রাত জাগল।

ফোশল্‌ভাঁ বার বার বলছিল, 'আপনি লোকের জীবন রক্ষা করেন, পরে তাদের চিনতেও পারেন না। এ আপনার ভারী অন্যায়। তারা কিন্তু আপনাকে ভুলে যায় না।'

ভাল্‌জাঁ বুড়োর অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা দেখে একটু মুচকি হাসলেন।

আশ্রমের প্রধানা কুমারীর কছে ফোশল্‌ভাঁ ভালজাঁকে ছোট ভাই বলে পরিচয় দিয়ে নিজের সাহায্যের জন্যে কাছে রাখবার অনুমতি ভিক্ষা করল। বিশ্বস্ততার সঙ্গে এতদিন কাজ করে এসেছে, কাজেই প্রধানা কুমারী তার প্রার্থনায় আপত্তি করলেন না। কোজেৎ আশ্রমের বিদ্যালয়ে ভরতি হল।

ভাল্‌জাঁ। ফোশল্‌ভাঁর কনিষ্ঠ সহোদর—এই পরিচয়েই আশ্রমের কাজে নিযুক্ত হলেন এবং তাঁকেও পায়ে ঘণ্টা বাঁধতে হল।

ভাল্‌জাঁ কোন কারণেই বাড়ীর বাইরে যেতেন না, বৃদ্ধ, অশক্ত ও খঞ্জ ফোশল্‌ভাঁকেই বাইরে যেতে হত। কেন না, তাঁর ভয় ছিল, জাভেয়র এখনও হাল ছাড়ে নি, ও অঞ্চলের প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি অবশ্যই রয়েছে।

এখন থেকে তাঁর নবজীবন শুরু হল। দেয়াল ঘেরা আশ্রমই তাঁর পক্ষে এখন সমগ্র পৃথিবী। সেখান থেকে যে পরিমাণ আকাশ দেখতে পেতেন, তাতেই তাঁর মন শান্ত ছিল। কোজেৎ তার বাবার কাছে প্রতিদিন একঘণ্টা করে থাকবার অনুমতি পেল, কাজেই তিনি এ ব্যবস্থায় সুখীই হলেন।

এর পর তাঁর জীবনে একটানা শান্তি নেমে এল। এখন থেকে তাঁর নাম হল ছোট ফোশল্‌ভাঁ।

ভাল্‌জাঁর হাতে পড়ে দেখতে দেখতে বাগানের চেহারা বদলে গেল। প্রচুর ফল ফুল হতে লাগল। বাগানের কাজ সম্পর্কে তাঁর একটা পূর্বধারণা ছিল, সেই ধারণা তাঁর কাজে এল।

আশ্রমের কুমারীরা সব সময়ই বিষণ্ণ থাকেন, আর ভাল্‌জাঁ ছিলেন সদাশয়। কোজেৎ উভয়ের মধ্যে তুলনা করত এবং ভাল্‌জাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় তার শিশু-অন্তর ভরে উঠত। বাবার কাছে আসবার সময় সে দৌড়ে আসত, তখন মালীর কুঁড়ে ঘর স্বর্গে পরিণত হত।

দেখতে বেখতে তাঁদের পাঁচ বছর কেটে গেল। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বৃদ্ধ ফোশল্‌ভাঁ মারা গেল। তার মৃত্যুর পর ভাল্‌জাঁ চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোজেৎকে নিয়ে আশ্রম ত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন, কেউ তা জানতে পারল না।

———

চৌদ্দ

কুমারী-আশ্রমের চাকরি ছেড়ে এসে ভাল্‌জাঁ প্যারিসে দু-তিনটে বাসা ভাড়া নিলেন, কখন কি প্রয়োজন হয় বলা ত যায় না।

এখন তাঁর নাম ফোশল্‌ভাঁ। কোজেৎকে মানুষ করে তোলাই যেন এখন তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ, শুধু এই জন্যেই যেন তিনি বেঁচে আছেন।

কোজেৎ এখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তাকে দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। তার সঙ্গে বারোঁ পঁমেয়র্‌সির একমাত্র পুত্র এবং মঁসিয়ো জিলনর্‌মার একমাত্র দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী মারিউস্‌-এর ভারী ভাব হয়েছে এবং কালক্রমে এই ভাব সত্যিকারের ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। ভাল্‌জাঁ প্রথমত তাদের এ ভালবাসাকে সমর্থন করেন নি—কেন না, কোজেৎ কাছে না থাকলে তাঁর বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে।

তা ছাড়া, মারিউস্‌ অভিজাতের উত্তরাধিকারী, যদি সে কোজেৎকে উপেক্ষা করে, যদি অনাদর করে।

তারপর ১৮৩২ সালের জুন মাস এল। প্যারিসের সর্বত্র বিদ্রোহের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজসৈন্যের লড়াই হতে লাগল। দেখতে দেখতে কত লোক যে হতাহত হল কে তার হিসাব রাখে?

ঠিক এই সময় একদিন মারিউস্‌ দাদা মহাশয়ের কাছে কোজেৎ-এর সঙ্গে বিবাহের দাবি পেশ করল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তার দাদা মহাশয় একজন ঝানু অভিজাত। তিনি কোজেৎ-এর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে যা জানতে পারলেন, তাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করতে পারলেন না। দৌহিত্রকে রাগের মাথায় বলে দিলেন, 'এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না। তুমি যদি আমার মতের বিরুদ্ধে এই বিবাহ কর,

তা হলে তোমাকে আমি ত্যাগ করব। আমাকে তুমি ভাল করেই জান, সুতরাং আশা করি, আমার মানসম্মান পদদলিত করে তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হবে না।'

দাদা মহাশয়কে সে অনেক করে বুঝাল, কিন্তু কোনই ফল হল না। বৃদ্ধ হেসে উঠলেন। জরাগ্রস্ত চক্ষু ক্ষণকালের জন্যে মুদ্রিত করলেন, মারিউস্‌-এর হাঁটুতে চাপড় মারলেন। তাঁর চেহারায় একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দেখা গেল। তিনি মারিউসের দিকে সোজা তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কোথাকার মূর্খ তুই! ও মেয়েটার বংশ-পরিচয় নেই। তার উপর, গায়ে পড়ে তোকে ভালবেসেছে, মেয়েটা ভাল নয়।'

মারিউস্‌ নিজের কর্তব্য বুঝতে পারল। সোজা উঠে গিয়ে মেঝে থেকে টুপিটা কুড়িয়ে নিল এবং দৃঢ় পদে দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং একবার পিছন ফিরে দাদা মহাশয়কে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে, 'পাঁচ বছর আগে আভিজাত্যের দম্ভে আপনি আমার বাবাকে অপমান করেছিলেন। আপনার এ আচরণ আমি কখনও ভুলব না, আর শুনে রাখুন, আপনার অর্থ আমি চাই নে। আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই রইল না।'

বৃদ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে হাঁ করে বসে রইলেন, পরে হাত বাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একটি কথা বার হবার আগেই দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। মারিউস্‌ চলে গেল।

আভিজাত্য-গর্বিত দাদা মহাশয় বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে রইলেন, যেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে গেছে, যেন কেউ তাঁর গলা চেপে ধরেছে। অবশেষে তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একানব্বই বছর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

তাঁর কন্যা ছুটে এলেন, চাকর-বাকরেরা দৌড়ে এল। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বলতে লাগলেন, 'দৌড়ে যাও, ওকে ফিরিয়ে আন। এ আমি কি করলাম? ও যে চলে যাচ্ছে! আমি ঠিক জানি, ও আর ফিরবে না।'

জরাগ্রস্ত দুর্বল হাতে জানলা খুলে রাস্তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ডাকতে লাগলেন, 'মারিউস্‌! মারিউস্‌! দাদু, ফিরে আয়, ফিরে আয় দাদু!'

মারিউস্‌ তাঁর ডাক শুনতে পেল না। সে তখন মোড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদা মহাশয়ের উপর অভিমান করে সে বিদ্রোহী দলে যোগ দিল। সেই দিনই একটা ছোটখাট দলের দলপতি হয়ে রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমে গেল।

কোজেৎ মারিউস্‌কে ভালবাসে, কাজেই ভাল্‌জাঁ যখন শুনতে পেলেন যে, মারিউস্‌ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে তখন তাকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দূর থেকে লড়াই দেখতে লাগলেন।

তিনি গিয়ে দেখলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইন্সপেক্টর জাভেয়রকে সরকারী গুপ্তচর সন্দেহে বিদ্রোহীরা গ্রেফ্‌তার করে হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে রেখেছে। সামরিক বিচারে তার প্রতি মৃত্যু দণ্ডের আদেশ হয়েছে।

বিদ্রোহীদের অনেকেই ভাল্‌জাঁকে চিনত, বলতে গেলে ঘনিষ্ঠতাই ছিল, কেন-না, বিদ্রোহীদের দলপতি মারিউস্‌ জাঁ ভালজাঁর ভাবী জামাতা। সুতরাং তিনি যখন তাদের কাছে প্রস্তাব করলেন, যে-শাস্তি তারা জাভেয়রের প্রতি ব্যবস্থা করেছে, সেই শাস্তিই তিনি নিজের হাতে দিতে চান। তৎক্ষণাৎ তারা প্রসন্ন মনেই তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

বন্দী জাভেয়রকে অদূরের একটি সরু গলিতে নিয়ে গেলেন, হাতে পিস্তল।

তিনি বন্দীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইন্সপেক্টর জাভেয়র, আমাকে চিনতে পার?'

প্রত্যুত্তরে দাম্ভিক জাভেয়র জবাব দিল, 'হাঁ, চিনতে পেরেছি। সুযোগ পেয়েছ, এবারে প্রতিশোধ নাও!'

ভাল্‌জাঁ পকেট থেকে একখানা ছুরি বের করলেন। জাভেয়র ছুরি দেখে বলল, 'ছোরা! ঠিক ওটাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী!'

ভাল্‌জাঁ প্রথমে জাভেয়রের কোমরের বাঁধন কাটলেন, তারপর হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে পায়ের বাঁধন দূর করলেন। পরে সোজা দাঁড়িয়ে তাকে—তাঁর পরম শত্রুকে—বললেন, 'ইন্সপেক্টর জাভেয়র, তুমি মুক্ত। যেখানে খুশি চলে যাও।'

জাভেয়র সহজে বিস্মিত হওয়ার মানুষ নয়। যদিও নিজের মন তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল, তবু সে চমকে না উঠে থাকতে পারল না। সে নিস্পন্দ হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাল্‌জাঁ বলতে লাগলেন, 'আমি এখান থেকে চলে যেতে পারব বলে মনে হয় না। যদি দৈবক্রমে চলে যাই, তবে তোমাকে বলছি, ফোশল্‌ভাঁ নামে আমি হোমিআর্মির সাত নম্বর বাড়ীতে বাস করি। সেখানে খোঁজ করলেই আমাকে পাবে।'

এই বলে তিনি তাঁর আসল ঠিকানাই তাকে বলে দিলেন। জাভেয়র বাঘের মত গর্জে উঠল, তার মুখের একপ্রান্ত খুলে তার দু পংক্তি দাঁতের ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে যে কথা বের হল তা হচ্ছে— 'সাবধান!'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'বেশ। তুমি এখন পালাও!'

জাভেয়র পুনরায় বললে, 'কি বল্‌লে? ফোশল্‌ভাঁ, হোমিআর্মি, তাই না কি?'

'সাত নম্বর।'

জাভেয়র অনুচ্চকণ্ঠে আওড়াল—সাত নম্বর।

জাভেয়র জামার বোতাম লাগাল। তার আকৃতিতে আবার পুলিসোচিত দাম্ভিকতা প্রকাশ পেল। তারপর আস্তে আস্তে গলি

থেকে বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে পড়ল ততক্ষণ ভাল্‌জঁা তার দিকে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাভেয়র আবার ফিরে এসে ভালজঁাকে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তোমার' আচরণে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। 'তুমি' বরং আমাকে মেরে ফেল।'

জাভেয়র বুঝতে পারল যে, সে ভাল্‌জঁাকে 'তুই' বলছে না।

ভাল্‌জঁা বললেন, 'চলে যাও!'

এই বলে ভাল্‌জঁা আকাশের দিকে পিস্তল ছুঁড়ে ফুটো ফাঁকা আওয়াজ করে গলি থেকে চলে এলেন।

অবরোধের হুদ্দার মধ্যে গিয়ে খবর দিলেন, 'কাজ শেষ হয়েছে।'

জাভেয়র আপন মনে বলতে লাগল, 'এই দেবতার মত মানুষটি, যিনি তাঁর চিরশত্রুকে হাতে পেয়েও তার প্রতি এত দয়া দেখালেন, পরম বন্ধুর মত আচরণ করলেন, কত শত সদনুষ্ঠানে যাঁর বিচিত্র জীবন পূর্ণ, শুধু নির্মম কর্তব্যের খাতিরে, চাকরির খাতিরে, যশের খাতিরে, সেই তাঁকেই সারা জীবন ধরে কত রকমে নির্যাতন করে আসছি, ধিক্‌ আমার জীবনে!'

জাভেয়র খানিকক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে বৃদ্ধের গমন-পথের দিকে চেয়ে রইল, তারপর, ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

রাজসৈন্যের হাতে বিদ্রোহীরা সেদিনকার মত পরাজিত হল। মারিউস্‌ আহত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। রাজসৈন্য পলায়নপর বিদ্রোহীদের পিছনে ধাওয়া করে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

ভাল্‌জঁা তাড়াতাড়ি আহত মারিউস্‌কে কাঁধে তুলে নিলেন এবং ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু সম্মুখে পিছনে সব জায়গায়ই তখন রাজসৈন্য ঘাঁটি আগলে রয়েছে। চারদিকে কেবল হানাহানি কাটাকাটির দৃশ্য। আহতদের আর্ত

চীৎকার রাজসৈন্যের উল্লাস ধ্বনির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। হৈ চৈ, গোলা গুলি ও ব্যাণ্ডের শব্দে কানে তালা লাগবার উপক্রম। মারিউস্‌কে নিয়ে কেমন করে এখান থেকে বেরুবেন তাই ভেবে ভাল্‌জাঁ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এর মধ্য দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

তবে দীর্ঘকাল কারাগারে বন্দী থাকায় তিনি পলায়নের বহুবিধ উপায়ই জানতেন। আজকে সেসব অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে এল। যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখান থেকে একটু দূরে রাস্তার উপর নর্দমার একটি বড় ঝাঁজরি দেখতে পেলেন। অতিকষ্টে জনতার মধ্য থেকে বের হয়ে সেই ঝাঁজরির কাছে গিয়ে তার ঢাকনা খুলে ফেললেন। নর্দমা দিয়ে একটি মানুষ অনায়াসেই নিচে নেমে যেতে পারে। যারা নর্দমা পরিষ্কার করে তারা এই পথেই চলাচল করে। ভাল্‌জাঁ মরণাপন্ন মারিউসকে কাঁধে তুলে এই গর্ত দিয়ে মাটির নিচেকার সুড়ঙ্গ-পথে নেমে গেলেন। অন্ধকারে আন্দাজে পা টিপে টিপে যে দিকে নর্দমার গড়ান সেই দিক লক্ষ্য রেখে তিনি নর্দমার মুখ পাবার আশায় চলতে লাগলেন। তাঁর কাঁধের উপর আধমরা অবস্থায় মারিউস্। সহসা দূরে ক্ষীণ আলো দেখে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হল।

এমনি ভাবে তিনি সেই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ-পথে নোংরা জলের মধ্য দিয়ে প্রায় আধঘণ্টা চললেন, অন্তত তিনি আপন মনে এই হিসাবই করছিলেন। শ্রান্তি ও অবসাদে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। বার বার কাঁধ বদলাতে লাগলেন। এখানে অন্ধকার খুব নিবিড়। সহসা তিনি সুমুখে নিজের ছায়া দেখতে পেলেন।

ভাল্‌জাঁর অনুমান ঠিকই। নর্দমার একটা মুখে এসে পড়লেন বটে, কিন্তু সেখান থেকে বের হবার উপায় নেই একটা প্রকাণ্ড লোহার ঝাঁজরি দ্বারা নর্দমার মুখটা বন্ধ। সেই ঝাঁজরি আবার একটি বড় তালা দিয়ে আটকান। ভিতর থেকে সে তালা ভাঙবার কোন উপায়ই

নেই। ভাল্‌জাঁ ভাবলেন, শেষে কি এই নর্দমার মধ্যেই মরতে হবে?

নর্দমার বাইরেই খোলা বাতাস, চাঁদের আলো!

নর্দমার একপাশে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি মারিউস্‌কে সেখানে শুইয়ে দিলেন। দু হাতে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই লোহার কবাট ঠেলতে লাগলেন। ব্যর্থ চেষ্টা! তাঁর এত পরিশ্রম এত কষ্ট সব বুঝি ব্যর্থ হতে চলল। তালা খুলে ফেলা ছাড়া পরিত্রাণের আর অন্ত কোন উপায় নেই। যে সব অস্ত্রের সাহায্যে তা সম্ভব সে সমস্তই তাঁর কাছে সর্বদা মজুত থাকে। কিন্তু যখন সে সব অস্ত্র তাঁর জীবনে একান্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল, তখনই সে সব তাঁর কাছে নেই। সে দিন যখন পোশাক বদলে লড়াইয়ের পোশাক পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন তখন সেগুলির কোন প্রয়োজন নেই মনে করে সঙ্গে আনেন নি। মারিউস্‌-এর পকেট হাতড়ে দেখলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু একখানা রুটি, গোটা কয়েক টাকা, আর একখানি নোটবুক ছাড়া কিছুই পেলেন না। কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না। মারিউস্‌-এর পকেটবুকখানা খুলে আপন মনেই নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি লেখার উপর তাঁর নজর পড়ল। পকেট-বুকের একটি পাতায় লেখা আছে ঃ

'আমার নাম মারিউস পঁমেয়রসি। আমার মৃত দেহ ৬ নম্বর র‍্যু-দে ফীয় দ্যু কালভেয়র-এ আমার মাতামহ মঁসিয়ো জিল্‌নরমঁার কাছে পৌঁছে দেবেন।'

ভাল্‌জাঁ ঝাঁজরির অস্পষ্ট আলোয় লেখাটি পড়লেন। খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, পুনরায় পকেট-বুকের লেখাটি আপন মনে আওড়ালেন। মারিউস্‌-এর পকেটে যে রুটিখানা পেয়েছিলেন ক্ষুধার তাড়নায় সঙ্গে-সঙ্গেই খেয়ে ফেললেন। তারপর কি ভেবে মারিউস্‌কে কাঁধে নিয়ে নর্দমার গড়ানের দিকে এগিয়ে চললেন।

পনর

অবশেষে ভালজাঁ নর্দমার শেষ প্রান্তে—সেন্ নদীর তীরে মুক্ত বাতাসে মুক্ত আলোর মধ্যে বের হয়ে এলেন।

অচৈতন্য মারিউস্‌কে নদীর তীরে ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে আঁজলা ভরে নদী থেকে জল এনে তার মুখে চোখে ঝাপটা দিলেন। তখন অতি ক্ষীণ ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল। ভাল্‌জাঁ আবার জল তুলছেন এমন সময় কে এসে তাঁর কাঁধে হাত দিল। তিনি ঘাড় ফিরিয়েই দেখলেন—স্বয়ং ইন্সপেক্টর জাভেয়র।

জাভেয়র কিন্তু ভালজাঁকে দেখেই চিনতে পারে নি—কেন না, তাঁকে তখন কারুরই চেনবার জো ছিল না।

জাভেয়র জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

'আমি জাঁ ভাল্‌জাঁ!'

নাম শুনে জাভেয়র একবার তাঁর মুখের পানে কড়া নজরে তাকাল। এতক্ষণে তাঁকে চিনতে পারল। তাঁর মুখ চোখের রং বদলে গেল, সে জোরে তাঁর কাঁধ চেপে ধরে রইল।

ভাল্‌জাঁ বললেন 'ইন্সপেক্টর জাভেয়র, আমি তোমার বন্দী। তা ছাড়া, সকাল থেকেই ত আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি নইলে তোমাকে আমার বাড়ীর ঠিকানা দিতাম না। আমি ধরা দিতে প্রস্তুত, তবে আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হবে।'

জাভেয়র ভাল্‌জাঁর কোন কথাই যেন শুনতে পেল না। তাকে অত্যন্ত চিন্তিত বোধ হল। সে এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অবস্থাটা তার জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। যেন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় অনুচ্চ কণ্ঠে আপনা-আপনি বলে উঠল, 'তুমি' এখানে কি করছ? এ কে?'

সে-ই যে জিজ্ঞাসা করছে তা তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে প্রায় বুঝা গেল না। সে এখন ভাল্‌জাঁকে 'তুই' বলে সম্বোধন করছে না।

ভাল্‌জাঁ উত্তর দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে জাভেয়র যেন জেগে উঠল।

'হাঁ, আমি ওর কথাই তোমাকে বলতে চাই। আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করতে পার, কিন্তু তার আগে একে বাড়ী পৌঁছে দিতে যে সময়টুকু লাগে সে সময়টুকু আমাকে ভিক্ষা দাও। বলা বাহুল্য, তুমিও আমার সঙ্গে এস। একে পৌঁছে দিয়েই আমি তোমার হাতে ধরা দিব।'

জাভেয়রের মুখখানি চিমসে গেল। সামান্য পরিমাণেও নিয়মভঙ্গ করে সে অপরকে দয়া দেখাতে পারে, একথা মনে হলে সব সময়েই তার মুখখানি অমনি ধারা চিমসে যায়। তবু সে 'না' বলতে পারল না।

এবার ভালজাঁ পকেট থেকে রুমাল বের করে জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে মারিউসের রক্তরঞ্জিত কপালখানি মুছে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, 'এ লোকটি অবরোধে ছিল। লোকের মুখে ওর নাম শুনেছি মারিউস্‌।'

জাভেয়র একজন প্রথম শ্রেণীর গুপ্তচর। কাউকে বিশ্বাস করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। কোন কারণেই কোন কিছু তার চোখ এড়ায় না, কান পেতে শোনা তার স্বভাব। জীবনে কিছুই সে ভোলে না।

সে মারিউসের হাত ধরে নাড়ী দেখল।

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'আহত হয়েছে।'

জাভেয়র বলল, 'মরে গেছে।'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'না, এখনও মরে নি। এখনও চেষ্টা করলে একে বাঁচানো যায়।'

জাভেয়র বললেন, একে ত 'আজই বিদ্রোহী-দলে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। এর নাম কি মারিউস ?'

ভাল্‌জাঁ জবাবে বললেন, 'হাঁ। আমি একে সেখান থেকেই নিয়ে এসেছি। ভয়ানকভাবে আহত হয়েছে।'

জাভেয়র পুনরায় বলল, 'আহত কি রকম, আমি তো দেখছি মারা গেছে।'

ভাল্‌জাঁ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'না, এখনও মরে নি। এর বাড়ী ৬নং র‍্যু-দে ফীয়্‌ দ্যু-কালভেয়র। এর দাদা মশাইয়ের নাম মঁসিয়ো জিলনরমাঁ।'

অদূরে একখানি ভাড়াটে গাড়ী অপেক্ষা করছিল। জাভেয়র হাঁকল, 'এই গাড়োয়ান!'

গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে এল। ভাল্‌জাঁ ও জাভেয়র দুজন ধরাধরি করে মারিউস্‌কে গাড়ীর পিছনের আসনে শুইয়া দিলেন এবং নিজেরা সুমুখের আসনে গিয়ে পাশাপাশি বসলেন! গাড়োয়ানকে ঠিকানা বলে দিলেন। গাড়ীর দরজা বন্ধ হল। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটল। দেখতে দেখতে গাড়ী বাঁধের উপর উঠে বাস্তাইলের দিকে চলল। বাঁধ ছেড়ে তারা পথে পড়ল। গাড়োয়ান তার নিজের জায়গায় বসেছে, একটা কালো ছায়া পড়ল। গাড়ীতে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মারিউসের দেহ নিস্পন্দভাবে পিছনের আসনে পড়ে আছে। তার মাথাটি হেলে বুকের উপর, হাত দুখানি দুপাশে ঝুলছে, পা দুখানি অসাড় হয়ে গেছে। দেহে যেন প্রাণবায়ু এতটুকু নেই, শবাধারে তুললেই হয়। ভাল্‌জাঁর শরীরটা যেন ছায়াময় আর জাভেয়রের পাথুরে। যেন দৈবক্রমে সে গাড়ীতে তিনটি শোচনীয় নিস্পন্দ মূর্তির একত্র সমাবেশ হয়েছে। শবমূর্তি, ছায়ামূর্ত্তি আর পাথরের মূর্তি পরস্পরের সম্মুখীন রয়েছে।

যথাসময়ে গাড়ী এসে জিলনরমাঁর বাড়ীর ফটকে উপস্থিত হল, রাত তখন দুপুর হয়ে গেছে, বাড়ীর সকলেই ঘুমোচ্ছে।

জাভের্যর গাড়ী থেকে নেমে ফটকের সেই গুরুভার কড়া দারুণ জোড়ে নাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খানিকটা খুলে গেল। জাভের্যর নিজের হাতে বাইরে থেকে দরজাটা ঠেলতেই আরও খানিকটা ফাঁক হল। দরোয়ান হাই তুলতে তুলতে কাঁচাঘুম থেকে উঠে বাতিহাতে কবাটের ফাঁকে এসে দর্শন দিল। এ অঞ্চলের সকলেই রাত্রির প্রথম দিকে ঘুমিয়ে পড়ে, বিশেষত যখন বিপ্লব উপস্থিত, তখন ত কোন কথাই নেই। জুজু আসছে শুনলে ছেলেরা যেমন সাত-তাড়াতাড়ি লেপের তলে মাথা লুকোয়, এই অঞ্চলের নির্বিরোধী লোকেরা বিপ্লবের ভয়ে সেরূপ সন্ত্রস্ত হয়ে শয্যার আশ্রয় নেয়।

জাভের্যর গম্ভীর স্বরে হুকুম করল, ম'সিয়ো জিল্‌নরম'াকে গিয়ে খবর দাও যে, তাঁর নাতীকে নিয়ে এসেছি, যুদ্ধে আহত হয়েছে।'

দরোয়ান ভিতরে গিয়ে জিল্‌নরম'ার চাকর-বাকরদের ডেকে নিয়ে এল। সকলে মিলে ধরাধরি করে মারিউস্‌কে উপরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শুইয়ে দিল এবং কে একজন ডাক্তার ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'মঃ জিল্‌নরম'া আছেন?'

'হাঁ আছেন। আপনার কি প্রয়োজন?'

'তাঁর নাতীকে নিয়ে এসেছি।'

দরোয়ান বুঝতে পারল না জিজ্ঞাসা করল, 'নাতী?'

'হাঁ, সে লড়াইয়ে মারা গেছে।'

কাদামাখা ছেঁড়া জামা গায়ে ভাল্‌জ'া জাভের্যরের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয়ে ভাবনায় দরোয়ানের মুখ কালো হয়ে গেছে, সে তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। ভাল্‌জ'া ইঙ্গিতে জানালেন যে মারিউস মরে নি।

দরোয়ান জাভের্যর বা ভাল্‌জ'ার ইঙ্গিত কিছুই বুঝতে পারল বলে মনে হল না।

জাভেয়র বলল, 'সে অবরোধে ছিল, তাকেই নিয়ে এসেছি।'

সবিনয়ে দরোয়ান বলল, 'অবরোধ!'

'সেখানে সে নিহত হয়েছে। যাও তার দাহুকে ডেকে দাও।'

দরোয়ান একপাও নড়ল না।

জাভেয়র পুনরায় বলল, 'যাও! আর দেরি করো না!'

দরোয়ান চাকর-বাকরদের ডাকাতেই সর্বাগ্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে শ্রীমতী জিল্‌নরমঁাই খবরটা পেলেন। বৃদ্ধকে কেউ খবর দিতে সাহস পাচ্ছিল না। তারা ভাবল, যা হবার তা ত হয়েই গেছে, এখন না হোক, একটু পরেই ত সব জানতে পারবেন। তবে যতটুকু দেরি হয় ততই বুড়োর পক্ষে ভাল।

এক সময় জাভেয়র ভাল্‌জাঁর কাঁধ স্পর্শ করল। ভাল্‌জাঁ তার অর্থ বুঝতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। জাভেয়র তাঁকে অনুসরণ করল। নীচে এসে জাভেয়র ও ভাল্‌জাঁ গাড়ীতে উঠতে যাবেন, এমন সময় ভাল্‌জাঁ বললেন, 'ইন্সপেক্টর জাভেয়র, এতই যদি দয়া করলে, তখন আর একটি মাত্র অনুরোধ রক্ষা কর। আমাকে মিনিট কয়েক সময় দাও, এক বার বাড়ী যাব।'

জাভেয়র খানিকক্ষণ কি ভাবল, পরে গাড়োয়ানকে ভাল্‌জাঁর ঠিকানা বলে গাড়ী চালাতে হুকুম দিল।

পথে কেউ কারুর সঙ্গে একটি কথাও কইলেন না। উভয়েই নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন। ভাল্‌জাঁর কি প্রয়োজন? যা আরম্ভ করেছেন তা শেষ করবেন। কোজেৎকে সাবধান করে দেবেন, মারিউস কোথায়, সে খবর তাকে বলবেন। হয় ত তাকে আর কোনও কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় জানাবেন। যদি সম্ভব হয়, তবে কোনও কোনও বিষয়ে চরম ব্যবস্থা করবেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে সব ফুরিয়ে গেছে, আর কিছু বাকি নেই। জাভেয়র যখন তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে, তিনি

কোন রকম বাধা দেন নি। বিশপের সংস্রবে আসার পর থেকেই নিজের জীবন সম্বন্ধে তিনি কিছু করতে চাইতেন না।

হোমি আর্মি লেনের মোড়ে গাড়ী থামল। সে গলিটা এত সরু যে, তার মধ্যে গাড়ী যেতে পারে না। জাভেয়র ও ভাল্‌জাঁ গাড়ী থেকে নামলেন।

গাড়োয়ান ইন্সপেক্টরকে বলতে চাইল যে আহত ব্যক্তির রক্তে ও হত্যাকারীর গায়ের কাদায় তার গাড়ী নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তাকে কিছু ক্ষতি পূরণ করা উচিত।

জাভেয়র বলল, 'তোমার কত পাওনা, তা-ই বল।'

'প্রায় সোয়া সাত ঘণ্টা সময় খেটেছি, তা ছাড়া, আমার গাড়ীর মখমল একেবারে নতুন ছিল। কাজেই আমাকে আশী ফ্রাঙ্ক দিন।

জাভেয়র পকেট থেকে চারিটি মোহর বের করে গাড়োয়ানকে দিল এবং গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

অন্য দিনের মত আজও গলিতে কেউ ছিল না। জাভেয়র ভাল্‌জাঁর পিছন পিছন চলল। সাত নম্বর বাড়ীতে গিয়ে কড়া নাড়তেই দরোয়ান দরজা খুলে দিল। জাভেয়র বলল, 'বেশ, উপরে যাও।' সে বিস্ময়জনক স্বরে আরও বলল, 'আমি এখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।' মনে হল, যেন বিশেষ চেষ্টা করেই সে এই কথাটা বলে ফেলল।

ভাল্‌জাঁ জাভেয়রের মুখের পানে অবাক হয় চেয়ে রইলেন, কেন না, জাভেয়রের পক্ষে আসামীর প্রতি এতটা ভদ্র ব্যবহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক ও নতুন। বিড়াল যেমন নিজের নখরের প্রান্ত পর্যন্ত মূষিককে পলায়ন করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, বর্তমান ক্ষেত্রে জাভেয়রের নিশ্চিন্ততাও সে রকম। ভাল্‌জাঁ আত্মসমর্পণ করে সব শেষ করে দিয়েছেন। এরূপ অবস্থায়, তাঁকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে দিতে জাভেয়র দৃকপাত করবে না, এতে তিনি বিশেষ

বিস্মিত হলেন না। হাত দিয়ে কপাটে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেললেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। দরোয়ান শুয়ে ছিল। হুড়কাটি খুলে দিয়েই আবার শুয়ে পড়ল। ভাল্‌জাঁ তাকে বললেন, 'আমি!' তার পর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন, দোতলায় পৌছে তিনি দাঁড়ালেন। দুঃখের সময় মানুষ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যেখানে ওঠা যায়, ঠিক সেইখানেই একটি শার্সি দেওয়া জানালা আছে। জানলাটি খোলাই ছিল। রাস্তার আলোয় এখানটাও কিছু আলোকিত ছিল। দম নিতে গিয়ে হোক, কি কলের পুতুলের মতই হোক, জানলা দিয়ে মাথা বের করে ঝুঁকে পড়লেন। গলিটা নেহাৎ ছোট্ট এবং একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পথের আলোকে আলোকিত। ভাল্‌জাঁ বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন—পথে কেউ নেই।

জাভেয়র চলে গেছে।

ভাল্‌জাঁ উপরে উঠে যেতেই জাভেয়র মুহূর্ত কয়েক মাত্র সেখানে চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পরে ধীরে ধীরে গলি ধরে চলতে লাগল।

জীবনে এই প্রথম তাকে চিন্তায় আকুল হতে দেখা গেল। হাত দুখানি পিছনে নিয়ে সে ধীর পায়ে চলেছে। আজ দুর্দান্ত ইন্সপেক্টর জাভেয়রের সর্বদেহে যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল। এ রকমটা একেবারে নতুন। তার চোখে মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে।

নরঘাতক দস্যু আজ তার জীবন দান করেছে! তার ঋণের বিনিময়েই আজ তাকে কর্তব্য ভুলে গিয়ে শুধু নিরুপায় হয়েই অপরাধীকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে! ন্যায়ের চক্ষে আজ জাভেয়র দস্যু জাঁ ভাল্‌জাঁর সঙ্গে সমতুল্য।

একটা বিষয় আজ জাভেয়রকে অবাক করে দিয়েছে! ভাল্‌জাঁ তাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিল। আর তার সব চাইতে বড় বিস্ময়

এই যে, জাভেয়রও আজ বাধ্য হয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁর জীবন দান করল, হাতে পেয়েও দস্যুকে ছেড়ে দিল

জাভেয়র আজ কর্তব্যে অবহেলা করেছে। ভাল্‌জাঁ আইনের চক্ষে অপরাধী, তা জেনেও জাভেয়র আজ আইন অমান্য করে অপরাধীকে ছেড়ে দিল। জীবনে যে কাজ সে কখনও করতে পারে না তা-ই তাকে করতে হল। আজ তার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

এ অপমান অসহ্য। জীবনের প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেল। আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই তার নেই।

একদিকে জাঁ ভালজাঁর কাহিনী, অপর পক্ষে মসিয়ো মাঁদলেনের নানা লোকহিতকর সদনুষ্ঠান—দুটোই পর পর তার মনে হল। আর দুয়ে মিলে ফোশল্‌ভাঁও তার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। ওদিকে দস্যু দাগী চোর ভালজাঁকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে তাকে চাকরি করে জীবন বাঁচাতে হবে। অসম্ভব, সে তা কিছুতেই পারবে না।

রাত দুপুর। পৃথিবীশুদ্ধ লোক ঘুমে অচেতন। রাজপথ জনশূন্য, নীরব, নিস্তব্ধ। অদূরে সেন নদীর উপর পুলটি দেখা যাচ্ছে। জাভেয়র গিয়ে পুলের উপর দাঁড়াল। টুপি খুলে একপাশে রেখে দিল। মাথার ভিতর একটা দুঃসহ বেদনা বোধ হচ্ছিল। মনে হল বাতাসে মাথাটা ঠাণ্ডা হতে পারে, কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়া দূরের কথা, আরও বেড়ে গেল।

বর্ষার সেন আজ কূলে কূলে পরিপূর্ণ। জাভেয়র পুলের যেখানটায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল, ঠিক তার নীচেই সেন নদীর গভীর দহ। জাভেয়র রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে সেন্‌-এর তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখতে লাগল।

রাত্রি অন্ধকার। চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয়, আজ সেনও

তার বিশাল মুখ ব্যাদান করে যেন জাভেয়রকে গিলে ফেলতে চাইছে। জাভেয়র মিনিট কয়েক কি ভাবল। হঠাৎ তার মুখে চোখে একটি স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানা একটা প্রশান্তিতে ভরে উঠল। একবার দুহাত জোড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝুপ করে একটা শব্দ হল, খানিকটা জল ছিটকে উঠল।

রাক্ষুসী সেন যেন একটা বিকট হাসি হেসে জাভেয়রকে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করে ফেলল।

নদীর বুকে কয়েকটা বুদ্বুদ উঠে আবার তখুনি মিলিয়ে গেল।

———

ষোল

মারিউসের আহত দেহ প্রথমে যে খাটে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে পরে তাকে বসবার ঘরে নিয়ে আসা হল। দেহ তখন নিস্পন্দ। চিকিৎসক ডাকা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এলেন, মারিউসের দিদিমাও উঠেছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় ভয়ে দুঃখে শোকে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি অকারণ ঘর-বার করতে করতে 'আমার কি হল গো' বলে অনুচ্চ কণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগলেন। কোন কাজেই তিনি মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না।

চিকিৎসক মারিউসের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলেন। নাড়ী তখনও রয়েছে। বুকে কোন বিশেষ ক্ষত হয় নি। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

মারিউসের গায়ের জামা-কাপড়ও খোলা হচ্ছে দেখে বুড়ী সরে গেলেন এবং নিজের ঘরে গিয়ে মালা জপ করতে শুরু করে দিলেন।

বুক বা পিঠের কোন অনিষ্ট হয় নি। একটি গুলি পঞ্জরের পাশ দিয়ে চলে যায়। ফলে ওই স্থানের খানিকটা ভীষণভাবে ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু সে ক্ষত গভীর নয়, বিপজ্জনকও নয়। কাঁধের হাড় ভেঙ্গে গিয়ে স্থানচ্যুত হয়েছে। নর্দমার মধ্য দিয়ে ভাল্‌জাঁ তাকে যে ভাবে বইয়ে এনেছেন তাতে ভাঙা হাড় আরও সরে গিয়েছে। ওখানকার আঘাত বেশ গুরুতর। হাতের নানা স্থানে তরবারির আঘাত লেগেছে। মুখে কোন আঘাত না লাগায় তা কোন রকম বিকৃত হয় নি, কিন্তু মাথার অনেক জায়গা কেটে গিয়েছে। আঘাতেই যে সে জ্ঞান হারিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই লক্ষণটি বিশেষ চিন্তার বিষয়। এরকম অবস্থায় অনেকের জ্ঞান ফিরে আসে না। বিশেষত অত্যধিক রক্তস্রাবের ফলে মারিউস অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার কাপড় ভাঁজ করে রক্তস্রাব বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। বিছানার একপাশে টেবিলের উপর তিনটি বাতি জ্বলছে এবং সেখানে ডাক্তারের অস্ত্রাদি রয়েছে। ডাক্তার মারিউসের মাথার চুল ও মুখ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিলেন।

ডাক্তারের মুখ বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে তিনি মাথা নাড়ছেন, যেন তিনি মনে মনে প্রশ্ন করছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিচ্ছেন।

ডাক্তাররা যখন নিজেদের সঙ্গে অপরের দুর্বোধ্য ভাষায় আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন তা রোগীর পক্ষে অশুভ সূচনা করে।

ডাক্তার যখন মারিউসের মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন এবং মুদ্রিত চোখ দুটি ধীরে ধীরে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করছিলেন, ঠিক সেই সময় বসবার ঘরের প্রান্তস্থিত দ্বার খুলে পাণ্ডুবর্ণ দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। ইনিই মারিউসের মাতামহ মঁসিয়ো জিল্নরমাঁ।

বিদ্রোহের জন্যে জিলনরমাঁর মন গত দুদিন অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ ছিল। ওই চিন্তায়ই তিনি বিব্রত ছিলেন। আগের দিন রাত্রে তাঁর মোটেই ভাল ঘুম হয় নি এবং সারাদিনই জ্বর ছিল। শরীরটা ভাল নয় বলে তিনি সন্ধ্যার পরেই শয্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘুমোবার আগে ঘরের যাবতীয় দরজা জালনা বন্ধ করে দিতে আদেশ করেন। ক্লান্তির ফলে তাঁর তন্দ্রা এসেছিল। বুড়োদের কখনও নিদ্রা গাঢ় হয় না। বসবার ঘরের পাশেই তাঁর শয়ন-ঘর। বাড়ীসুদ্ধ সকলের বিশেষ সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও গোলমালে পদশব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। দরজার ফাটল দিয়ে আলোকরশ্মি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং বিছনা ত্যাগ করে অন্ধকারে পথ খুঁজে নিয়ে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। অজানা ভয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ সাদা পোশাকে ঢাকা।

তিনি দেখলেন বিছানায় একটি রক্তাক্ত-দেহ তরুণ যুবক শুয়ে

আছে। অত্যধিক রক্তস্রাবে তার দেহ মোমের মত সাদা হয়ে গেছে। চোখ দুটি মুদ্রিত, মুখ খুলে আছে, ঠোঁট দুটি পাণ্ডুর, দেহের উর্ধ্বাংশ খোলা, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত, নিস্পন্দ। সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল আলোক এসে পড়েছে।

তিনি কাঁপতে কাঁপতে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, 'মারিউস!'

একটি চাকর জবাব দিল, 'মারিউস্‌কে এই মাত্র দিয়ে গেল। তিনি অবরোধে গিয়েছিলেন, এবং—'

বৃদ্ধ রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, 'মরে গেছে! নির্বোধ কোথাকার!'

সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ যুবকের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ডাক্তার, সত্যি বলো, ও মরে গেছে?'

ডাক্তারের মন উদ্বিগ্ন। তিনি নীরব রইলেন।

জিল্‌নরমাঁ ভীষণ অট্টহাসি হাসতে হাসতে হাত মোচড়াতে লাগলেন।

'মরে গেছে! মরে গেছে! এই জন্মেই সে অবরোধে গিয়েছিল! আমার উপর অভিমান করেছিল! আমাকে জব্দ করবে বলে মরল! হায় হতভাগ্য, এমনি করেই কি জব্দ করতে হয়!'

তাঁর যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাল করে জানলা খুলে দিলেন। তারপর অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে সোজা পথের দিকে রাত্রিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন:

'ওকে তারা মেরে ফেলেছে,। ও বেশ জানত যে, আমি ওর প্রতীক্ষায় বসে আছি, ওর ঘর সাজিয়ে রেখেছি, ওর ছেলেবেলাকার ফটো আমার চোখের সামনে রয়েছে। ... তুই বেশ জানতিস যে, ফিরে একবার 'দাদু, অমি এসেছি' বলেই এই বাড়ীর তুই কর্তা হতে পারবি ... আমি তোর কথা শুনতাম। তোর এই বুড়ো দাদামশায়কে

তোর ইচ্ছামত চালাতে পারতিস। তুই তা বেশ ভাল করেই জানতিস। কিন্তু তুই ভাবলি, না, দাদু রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁর কাছে যাব না। আমাকে জব্দ করবি বলে অবরোধে গিয়ে নিহত হলি। এমনি করেই কি প্রতিশোধ নিতে হয়! যা হবার হয়েছে, শান্তিতে ঘুমো। তুই মরলি আর আমি জেগে উঠলাম!

ডাক্তার উভয়ের জন্যই উদ্বিগ্ন হলেন। ক্ষণকালের জন্যে মারিউসের কাছ থেকে জিল্‌নরমাঁর কাছে গেলেন। জিল্‌নরমাঁ ফিরে তাঁর দিকে তাকালেন। মনে হল, তাঁর চক্ষু দুটি যেন দেখতে দেখতে বড় লাল হয়ে উঠল। তিনি শান্তভাবে বললেন, 'ডাক্তার, তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি স্থির হয়েছি। আমি পুরুষ, ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যু দেখেছি। কেমন করে সব কিছু সইতে হয় আমি জানি। যত অনিষ্ট করছে সব তোমাদের এই খবরের কাগজগুলি। তোমরা চাও, লেখক, বক্তা, উকিল, বাগ্মী, জনসাধারণের রক্ষক, উন্নতি, আলোক, মানুষের অধিকার—ফলে, তোমাদের ছেলেরা এমনিই করে ঘরে ফিরবে।... মারিউস, কি করলি? নিহত হলি! আর তাও আমার আগে!... ডাক্তার, মনে করো না, আমি রেগেছি। যে মরে গেছে, তার উপর কেউ রাগ করে না। এই তরুণকে আমি লালন করেছি, সে যখন নিতান্ত শিশু, আমি তখনই বৃদ্ধ। ওর মা নেই।'

তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'কোথায় তুই আমোদ প্রমোদে দিন কাটাবি, না, যুদ্ধ করতে গিয়ে গুলির ঘায়ে মরলি! কার জন্যে? কেন? সাধারণতন্ত্রের জন্যে লড়তে গিয়ে এই বিশ বছর বয়সেই সব খোয়ালি। ··· কাকে ফেলে যাচ্ছে, একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখাও দরকার বোধ করল না।... আর আমি, বৃদ্ধ—অতিবৃদ্ধ আমি বেঁচে রইলাম! যাক, মোটের উপর, ভালই হয়েছে। আমিও এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। অনেক দিন পৃথিবীতে বেঁচে আছি, তার শাস্তি পেলাম। অনেক

আগেই ত মরবার বয়স পার হয়েছি। ··· কেন অনর্থক পরিশ্রম করছ, ও কি আর বেঁচে উঠবে ?'

এমন সময় মারিউস ধীরে ধীরে চক্ষু মেলে তাকাল। শোকার্ত বৃদ্ধ জিল্‌নরমাঁর উপর গিয়ে তার দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অবসাদ মেশানো বিস্ময়ে সে দৃষ্টি অনুজ্জ্বল।

বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'দাদু! তুই তা হলে বেঁচে আছিস, বেঁচে আছিস তুই! ভগবান, তুমি রক্ষা করো!'

বুড়ো আর কিছু বলতে পারলেন না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

মারিউস অনেক দিন জীবন্মৃতের মত বিছানায় পড়ে রইল। কয়েক সপ্তাহ তার জ্বর রইল। জ্বরের সময় সে প্রলাপ বকত। তার মস্তিষ্কে গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। মাথায় যে সব ক্ষত ছিল সেগুলির জন্যে নয়, যে সব আঘাতে ওই সব ক্ষত হয়েছিল সে আঘাতের ফলেই ও রকম হয়েছিল। রোগের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়েছে তখন প্রলাপের মধ্যে সারারাত কোজেৎ-এর নাম করেছে। কয়েকটা ক্ষত এরকম বড় যে তাতে বিষম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল! চিকিৎসক বারংবার বলতে লাগলেন, রোগীর মনে কোন মতেই উত্তেজনার কারণ যাতে না আসে সেই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। নানা রকম ওষুধের সাহায্যে ও চিকিৎসকের কড়া পাহারায় ক্ষত শুকিয়ে এল। যতদিন বিপদের সম্ভাবনা ছিল জিল্‌নরমাঁ পক্ষীমাতার মত নাতীর বিছানার পাশে বসে থাকতেন।

বাড়ীর দরোয়ান খবর দিল, প্রতিদিন এবং কখনও বা দিনে দুবার করে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে মারিউসের খবর নেন। সেই ভদ্রোলোক খুব দামী জামা-কাপড় পরে আসেন। এবং ক্ষত বাঁধবার জন্যে পরিষ্কার কাপড় সঙ্গে নিয়ে আসেন।

যে কালরাত্রিতে মুমূর্ষু অবস্থায় মারিউস্‌কে তার দাদুর বাড়ীতে আনা হয়েছিল তার ঠিক চারিমাস পরে, ৭ সেপ্টেম্বর চিকিৎসক জানালেন যে, মারিউসের জীবনের আর কোন আশঙ্কা নেই। মারিউস সেরে উঠতে লাগল। কাঁধের হাড় ভেঙে যাওয়ায় মারিউস আরও দুমাস ইজিচেয়ারে শুয়ে কাটাতে বাধ্য হল।

সে যাই হোক, দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় ও তার সেরে উঠতে দেরি হওয়ায় মারিউস অভিযোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। সমাজের বর্তমান অবস্থায় বিদ্রোহে সকলেরই এত দিক দিয়ে দোষ ত্রুটি থাকে যে, সকলেরই চোখ বুজে থাকা দরকার হয়।

জিল্‌নরমাঁও সবরকম কষ্টই ভোগ করলেন। পরে অবশ্য তাঁর সকল দিক দিয়েই আনন্দের কারণ দেখা দিল। সারারাত মারিউসের বিছানার পাশে রাত্রি যাপন করতেন, তাঁকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না।

যেদিন চিকিৎসক জানালেন যে, মারিউস নিশ্চিত আরোগ্য লাভ করবে, সে দিন বুড়োর আর আনন্দ ধরে না। তিনি আনন্দের আতিশয্যে দরোয়ানকে তিনটি মোহর বকশিশ দিলেন। একদিন যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না, এখন তাঁর অস্তিত্বেই অগাধ বিশ্বাস এসে গেল। সেই ঈশ্বরের উপাসনা পর্যন্ত তিনি করতে লাগলেন।

মারিউসের আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পাগলের মত বাজে বকতে শুরু করলেন। অকারণ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারতেন না। মারিউসকে ব্যারন বলে সম্বোধন করলেন। 'সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক' এই আওয়াজও তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল। মাতৃহীন শিশুর পক্ষে দিদিমা যেমন স্নেহশীলা, তিনিও মারিউস্‌কে ততখানি স্নেহরসে সিক্ত করে তুলেছিলেন। মারিউস্‌ই

যেন এবাড়ীর গৃহস্বামী। আনন্দের আধিক্যে তিনি নিজের আধিপত্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। এতটা সুখী হয়ে পড়লেন যে, নিজের জন্মগত দাম্ভিকতাও হারিয়ে ফেললেন। মারিউস যখন আরোগ্যের পথে, সেই সময় পাছে মারিউস বিরক্ত হয় বা তার ক্লান্তি আসে, সেই ভয়ে তিনি নাতীর দিকে পিছন করে অলক্ষিতে মৃদু হাসতেন।

সারাক্ষণ কিন্তু মারিউসের একটি চিন্তা। সে চিন্তা কোজেৎ।

যখন তার জ্বর ছেড়ে গেল, আর প্রলাপ রইল না, তখন সে আর কোজেৎ-এর নামও মুখে আনত না। লোকে মনে করতে লাগল, সে বুঝি কোজেৎ-এর কথা ভুলে গেছে। সে তার নাম করত না বটে কিন্তু তার মন সারাক্ষণ কোজেৎকেই খুঁজে বেড়াত। কোজেৎ কোথায়, কি করছে, কেমন আছে কিছুই সে জানে না। সব কিছুই স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বন্ধুগণ, লড়াই, ধোঁয়া—সব কিছুই অস্পষ্ট মনে হল। সেই অবরোধের মধ্যে ফোশল্‌ভাঁর বিস্ময়জনক আবির্ভাব প্রহেলিকার মতই তার মনে পড়ছে। কেমন করে তার জীবন রক্ষা হল, কিছুতেই আজ বুঝে উঠতে পারে না। কে, কেমনে তাকে রক্ষা করল, সে নিজে বা তার পরিজন বা অনুচরেরা কেউ জানত না। তারা এই মাত্র বলতে পারল যে, রাত্রিকালে ভাড়াটে গাড়ী করে তাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গিয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সবকিছুই তার কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু সেই অস্পষ্টতার মধ্যে একটি মাত্র কামনা উদগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে: কোজেৎ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। জীবন ও কোজেৎ—এ দুয়ের মধ্যে তার কাছে কোন পার্থক্য ছিল না। সে মনে মনে স্থির করেছে যে, কোজেৎ-কে বাদ দিয়ে সে বেঁচে উঠতে চায় না, তার দাদুই হোন, ভাগ্য-দেবতাই হোন কিংবা নরকই হোক, যে-কেউ তাকে বেঁচে থাকতে বাধ্য করবে, মারিউস তার কাছ থেকেই কোজেৎকে

কেড়ে নেবে। তবু তার সংকল্প কার্যে পরিণত হওয়ার অনেক অন্তরায় আছে, এ সত্যটাও তার অজানা ছিল না।

দাছুর পরিবর্তনে বা আরোগ্য লাভে মারিউসের মন কিছুমাত্র নরম হয় নি। দাছুর মনের পরিবর্তনে সে আস্থা স্থাপন করতে পারছিল না। তার মনে হয়েছে, তার মন জয় করবার জন্যেই বৃদ্ধের এ চাতুরী। যতক্ষণ না মারিউস দাছুর কথার বিরোধিতা করছে ততক্ষণ তাঁর সহৃদয়তা অটুট থাকবে, এ বিশ্বাসই সে করছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর যখন কোজেৎ-এর প্রসঙ্গ উঠবে তখন দাছুর মনের চেহারা অন্য রকম দেখা দিবে। আবার অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু হবে, সঙ্গে সঙ্গে সনাতন যুক্তির ঝড় বয়ে যাবে। কাজেই মারিউস আগে থেকে তৈরি হচ্ছে।

স্বাস্থ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে দাদা মশায়ের প্রতি কিছুটা কঠোরতা ফিরে এল। বুড়ো তাতে কিঞ্চিৎ মনোকষ্ট পেলেন। জিল্‌নরমাঁ লক্ষ্য করলেন যে, মারিউস একবারও তাঁকে 'দাছু' বলে সম্বোধন করে নি তিনি যে এটা লক্ষ্য করেছেন, বাইরে তা প্রকাশ পেতে দিলেন না। মারিউস এমনি ভাবে কথা বলেছে যাতে 'দাছু' বা 'দাদামশাই'—কিছুই বলার দরকার না হয়। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, হয় দাদামহাশয়-নাতীর মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে যাবে, নয় ত সদ্ভাব স্থাপিত হবে।

একদিন বিপ্লব সম্বন্ধে দাদা মহাশয়ের মন্তব্যে মারিউস এমন জবাব দিল যে, বৃদ্ধের মুখে আর কথা যোগাল না। তিনি কোন কারণেই মত পরিবর্তন করবেন না। সারা দিন যখন তিনি কথা কইলেন না তখন নাতীর মনে হল যে, উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য প্রত্যাসন্ন। কোজেৎ-এর সঙ্গে বিবাহে যদি তিনি সম্মতি না দেন তা হলে অনাহার ও অচিকিৎসা-ধর্মঘট করে তাঁকে জব্দ করবার সংকল্প করল। হয় সে

কোজেৎকে পাবে, নয় ত প্রাণত্যাগ করবে। সে ধৈর্যের সঙ্গে অনুকূল মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রইল।

একদিন দিদিমা টেবিলের উপরকার ওষুধের শিশিগুলি সাজিয়ে রাখছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধ জিল্‌নরমাঁ মারিউসের উপর ঝুঁকে পড়ে কোমল স্বরে বললেন, 'দেখ মারিউস, আমি হলে এখন মাছের বদলে মাংস খেতাম। আরোগ্যের প্রথম অবস্থায় মাছ ভাল বটে তবে রোগীর গায়ে বল হওয়ার জন্যে ভাল কাটলেট খাওয়া দরকার।'

মারিউস এ সুযোগ ত্যাগ করল না। সকল শক্তি দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'কি কথা?'

আমি বিয়ে করব।"

'বেশ, রাজি আছি।' বলেই বৃদ্ধ হেসে উঠলেন।

'রাজি, কি রকম?'

'হাঁ, রাজি আছি, তোমার কোজেৎকেই পাবে।'

এই অচিন্তিত সৌভাগ্যের আনন্দে মারিউস বিহ্বল ও জ্ঞানহারা হয়ে পড়ল। সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল।

জিল্‌নরমাঁ বললেন, 'হাঁ, তোমার কোজেৎকে পাবে। প্রতিদিন একজন বয়স্ক লোক এসে তার হয়ে তোমার খবর নিয়ে যান। তোমার আহত হওয়ার খবরে কোজেৎ কাঁদছে এবং ব্যাণ্ডেজের কাপড় তৈরির কাজে নিযুক্ত আছে। খবর নিয়ে জেনেছি, তারা সাত নম্বর হোমিআর্মি লেনে বাস করে। কেমন, হয়েছে! বলছি ত, তাকে তুমি পাবে। আমাকে ঠকাবে ভেবেছিলে, কিন্তু পারলে না। আমারও একদিন ছিল। আমার জীবনেও কোজেৎ ছিল। এই জীবনে কতই না দেখলাম। ভেবেছিলে, আমার সঙ্গে এ নিয়ে

মনোমালিন্ত হবে। কিন্তু জানতে না যে আজ আমি বৃদ্ধ, ভীরু হয়ে গেছি। ভেবেছিলে, এ নিয়ে লম্বা বক্তৃতা দেবে কিন্তু সব ভেস্তে গেল! আমি একেবারে বোকা নই। তলে তলে তার খোঁজ নিয়েছি। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, এককথায়, খাসা মেয়ে। তোমার ক্ষত বাঁধবার জন্তে যত ব্যাণ্ডেজের কাপড় দরকার, সব সে-ই ঠিক করে পাঠাচ্ছে। সে তোমাকে সত্য সত্যই ভালবাসে। তোমার মৃত্যু হলে তিনটি কবরের দরকার হত। ভেবেছিলাম, তাকে একদিন আনাব। কিন্তু অনেক কিছু ভেবে তা করিনি, হঠাৎ তাকে কাছে পেলে উত্তেজনায় তোমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সে যাই হোক, আমার যা বলবার ছিল বললাম, করণীয় যা, তাও অবিলম্বে সম্পন্ন করব। তুমি সুখী হও, এই আমার একমাত্র কামনা।'

এই বলে বৃদ্ধ কাঁদতে লাগলেন। তিনি মারিউসের মাথাটি নিজের বুকে চেপে ধরলেন এবং উভয়েই কাঁদতে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

মারিউস বললেন, 'দাদু!'

বৃদ্ধ প্রসন্ন মনে তৃপ্তির হাসি হেসে উঠলেন।

———

সতর

মারিউস ও কোজেৎ আবার উভয়ের সাক্ষাৎ পেল। কোজেৎ জিল্‌নরমাঁর নির্দেশে ভাল্‌জাঁর সঙ্গে এল। তারা যখন এল তখন সে ঘরে পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কোজেৎ যখন মারিউসের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় দাদু ইচ্ছে করেই হাঁচতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে হাঁচি থামালেন এবং কোজেৎ-এর দিকে নজর পড়তেই তিনি আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। আপন মনেই বলে উঠলেন 'এ যে দেবী!'

ভাল্‌জাঁকেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। তিনি স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও মানসিক আনন্দ ও বিষাদ চাপতে পারছিলেন না। একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের দেখছিলেন। আহত মারিউসকে যে দিন তিনি এ বাড়ীতে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন সেদিন তাঁর আকৃতি ছিল ভীষণ, তাঁর সর্বাঙ্গে রক্ত ও কাদা মাখা। দরোয়ান তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর বগলে কাগজে মোড়া একটা বাণ্ডিল—যেন একখানা বই কাগজে মুড়ে এনেছেন।

জিল্‌নরমাঁ তাঁকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে মঁসিয়ো ফোশল্‌ভাঁ, আমার দৌহিত্র শ্রীমান ব্যারন মারিউস পঁমেয়রসির সঙ্গে আপনার কন্যা শ্রীমতী—র বিবাহ দিতে সংকল্প করেছি। আপনার সম্মতি প্রার্থনা করি।'

জবাবে ফোশল্‌ভাঁ শুধু নমস্কার করলেন।

জিলনরমাঁ বললেন, 'এ বিবাহে তা হলে, আপনার অসম্মতি নেই?'

'নিশ্চয়ই না, এ আমার সৌভাগ্য।'

তখন জিল্‌নরমাঁ স্বভাববশে এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা দিলেন, তাতে এ বিবাহের যৌক্তিকতা ও কোজেতের যোগ্যতা সম্বন্ধে ওজস্বিনী

ভাষায় উল্লেখ ছিল। তার পর তিনি সকলকে শুনিয়ে মারিউসকে বললেন, 'আমার যা-কিছু আছে তার অর্ধেকের বেশিটাই সংসার-ব্যয়ের জন্যে নির্দিষ্ট আছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি যদি আরও বিশ বছর বাঁচি তা হলে তখন তোমাদের কপর্দকও অবশিষ্ট থাকবে না। তখন কোজেৎ, তুমি ব্যারনের স্ত্রী হলেও কোনও রকমে তোমাকে জীবন যাপন করতে হবে।'

এমন সময় তাঁরা শুনলেন, কে যেন ধীর গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'শ্রীমতী ইউফ্রেসি ফোশল্‌ভাঁর প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক আছে।'

কথাটা ভাল্‌জাঁর। তিনি এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। তিনি যে ওখানে আছেন, সেটা কেউ জানত বলে মনে হল না। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে এদের আনন্দের অংশ গ্রহণ করছিলেন।

জিল্‌নরমাঁ চমকে উঠে বলে উঠলেন, 'এর সঙ্গে ইউফ্রেসির কি সম্পর্ক?'

কোজেৎ বলল, 'আমারই নাম ইউফ্রেসি।'

জিল্‌নরমাঁ বললেন, 'ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক?'

ভালজাঁ বললেন, 'হয় ত চৌদ্দ কি পনর হাজার কম হতে পারে।'

ভাল্‌জাঁর বগলে কাগজে মোড়া যে বইখানা ছিল সেটি তিনি টেবিলের উপর খুলে ফেললেন। তখন দেখা গেল, বই নয়, নোট। গুণে দেখা গেল, পাঁচ লক্ষ চৌরাশি হাজার ফ্রাঙ্কের নোট আছে।

জিল্‌নরমাঁ হাসতে হাসতে বললেন, 'এত দেখছি চমৎকার বই!'

শ্রীমতী জিল্‌নরমা তাঁর কন্যাকে (মারিউসের ছোট মাসিকে) বললেন, 'পাঁচ লক্ষ চৌরাশি হাজার ফ্রাঙ্ক!'

তখন বৃদ্ধ জিল্‌নরমাঁ বললেন, 'তা হলে ত আর কোন ভাবনাই রইল না। মারিউসও কম শয়তান নয়, ডুবে ডুবে বেশ জল খেয়েছে। শুধু রাজকন্যা নয়, তার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বও! বাহবা!'

মারিউস ও কোজেৎ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। তাদের দৃষ্টি ও মন তখন কোন দিকেই ছিল না, তারা কিছুই জানতে পারল না।

বিবাহের সব ঠিক হয়ে গেল। ১৮৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি শুভকাজের দিন স্থির হল। জিল্‌নরমাঁ আনন্দে মশগুল হয়ে বিবাহের সব কিছু আয়োজনে মেতে উঠলেন।

কোজেৎ যাতে সুখী হয় তার যাবতীয় অন্তরায় দূর করে ভাল্‌জাঁও তাঁর করণীয় সব সমাধা করলেন। বরপক্ষকে বললেন, কোজেৎ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছে সে বংশের তিনি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তিনি কোজেৎ-এর বাবা নন, কোজেৎ-এর বাবা ছিলেন ফোঁশল্‌ভাঁ। তাঁরা দু ভাই পিকপাস কুমারী-আশ্রমে মালীর কাজ করতেন। সেখানে খবর নিয়ে জানা গেল যে, ভাল্‌জাঁর বিবরণ সত্য। কুমারী-আশ্রমের সন্ন্যাসিনীরা দুভাই ও কোজেৎ-এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। পাঁচ লক্ষ চৌরাশি হাজার ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে জানালেন যে, একজন হিতৈষী কোজেৎকে এই টাকা দান করেন, তিনি তাঁর নাম প্রকাশে আপত্তি করায় তৃতীয় ব্যক্তির কাছে টাকাটা গচ্ছিত ছিল। কথা ছিল, কোজেৎ সাবালিকা হলে বা তার বিবাহের সময় টাকাটা তাকে দিতে হবে।

কোজেৎ শুনল, যাঁকে এতদিন পিতা বলে জানত, আসলে তিনি তার পিতা নন। অন্য সময় হলে এ সংবাদে তার মন ভেঙে পড়ত, কিন্তু এখন সে ভাবী স্বামী নিয়েই মেতে আছে। সে মারিউসকে পাচ্ছে, মারিউস যুবক, কাজেই বৃদ্ধ তার মন থেকে মুছে গেলেন। অবশ্য সে ভাল্‌জাঁকেই বাবা বলতে লাগল।

এ দিকে মারিউস তার জীবনরক্ষাকারীর সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু কোন মতেই তাঁর সন্ধান পাচ্ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় মারিউস ও কোজেৎ ভালজাঁর সমক্ষে সেই অজ্ঞাতনামা জীবনরক্ষকের সন্ধানের কথা বলছিল। কিন্তু ভাল্‌জাঁ শুনে কোন মতামত প্রকাশ করলেন

না, আগ্রহও দেখালেন না। তাতে মারিউস একটু রুষ্ট হল। সে বলতে লাগল, 'তিনি যেই হোন, তিনি যে মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি কি করেছেন জানেন? তিনি দেবসেনাপতি কার্তিকের মত আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। যে স্থানে তখন যুদ্ধ হচ্ছিল, তিনি সেখানে নিজের প্রাণের মায়া না রেখে প্রবেশ করে আহত অবস্থায় আমাকে সেই ভীষণ নর্দমার ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে এসেছেন। কি উদ্দেশ্য ছিল? শুধু আমাকে বাঁচানো। যেমন করে পারি তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করবই।'

ভাল্‌জাঁ কিছু বললেন না।

আঠার

অনেক দিন বাদে মারিউস পঁমেয়রসি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। ১৮৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কোজেৎ-এর সঙ্গে তার শুভবিবাহ হয়ে গেল। মঁসিয়ো ফোশল্ভঁা এ বিয়েতে বর-কনেকে প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক যৌতুক দিলেন।

বিয়ের পর একদিন তিনি মারিউসের সঙ্গে দেখা করলেন। নিজের জীবনের কথা, কোজেৎ-এর কথা—একে একে সব কিছুই জানালেন: তিনি কোজেৎ-এর বাবা নন, কোজেৎ তার পালিতা কন্যা। চুরির দায়ে তিনি উনিশ বছর কয়েদ খেটেছেন, পরে আরও একটি অপরাধে তাঁর সারা জীবন কয়েদবাসের আদেশ হয়। তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—সব কিছুই একে একে মারিউসকে বললেন।

'সব ত শুনলে, এখন বল, আমার কি কোজেৎ-এর সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা রাখা উচিত?'

মারিউস কি ভাবল. তারপর বলল, 'এ অবস্থায় সম্পর্ক যত কম থাকে ততই হয় ত ভাল।'

সে কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি যে, এই ভাল্জঁাই তার জীবন বাঁচিয়েছেন।

তিনি কোজেৎ-এর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। অথচ বাবা কেন আসেন না, তার কোন হেতুই বেচারা কোজেৎ খুঁজে পেলে না। মারিউসও তাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি।

কিন্তু একদিন এক অদ্ভুত উপায়ে মারিউস ভাল্জঁা সম্বন্ধে সব কথাই জানতে পারল। সত্য বটে ইনি দাগী আসামী, চুরির দায়ে দীর্ঘকাল কয়েদ খেটেছেন, তবু এঁর কার্যাবলী অনন্যসাধারণ, ইনি মহৎ। এই আত্মভোলা পরোপকারী লোকটিই কয়মাস আগে নিজের জীবন বিপন্ন

করে বিপ্লবের সময় তাকে বাঁচিয়ে ছিলেন। কেন না, মারিউস তার পালিতা কন্যাকে ভালবাসে।

মারিউস সব কথা শুনে তখনই সেই মহাত্মার পায়ের ধুলো নিয়ে জীবন ধন্য করবে মনে করে কোজেৎকে সঙ্গে নিয়ে ভাল্‌জাঁর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল।

এদিকে মাসখানেক ধরে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচবেন না।

মারিউস ভাল্‌জাঁর শয়ন-ঘরের দরজার কড়া নাড়ল!

ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে ভাল্‌জাঁ বললেন, 'কে? ভিতরে আসুন।'

দরজা খুলে কোজেৎ ছুটে গিয়ে বৃদ্ধের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মারিউস দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে এসে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

ভাল্‌জাঁ একখানা আরাম চৌকিতে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর হাত দুখানি চেয়ারের হাতলে ঝুলে রয়েছে, শরীর শীর্ণ, মুখখানি ফ্যাকাশে, কিন্তু চোখ দুটি থেকে আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে।

কোজেৎ কাঁদ-কাঁদ স্বরে ডাকল, 'বাবা!'

'কে, কোজেৎ! মা, তুই এলি! কই, মারিউস আসেন নি?'

মারিউস অদূরে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই বুড়ো বলে উঠলেন, 'এই যে বাবাও এসেছেন! বাঃ! তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? আমাকে কি আজও ক্ষমা করতে পারলে না বাবা?'

রুদ্ধ অভিমানের বাঁধ ভেঙে গেল। কোজেৎ বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। মারিউস ঠায় দাঁড়িয়ে পিতা-পুত্রীর এই উত্তাল উচ্ছ্বাস দেখতে লাগল। তার নিজের চোখ বেয়েও অশ্রু ঝরে পড়বার উপক্রম হল।

কোজেৎ কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবা!—'

সে আর বলতে পারল না।

'তুইও আমাকে ক্ষমা কর্‌ মা!'

কোজেৎ গায়ের শালখানা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে চেয়ারের হাতলে বসে বুড়োর মাথার চুলগুলোয় বিলি কেটে দিতে লাগল। ভাল্‌জাঁ কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না। বহুকাল বাদে কোজেৎ-এর আদর পেয়ে বুড়ো আনন্দে এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে কথা তাঁর মুখ থেকে ঠেকে ঠেকে বের হতে লাগল :

'আমি কি বোকা! তোকে আর দেখতে পেলাম না—এই কথাটাই যে কেন আমার মনে হল সেই কথাই ভাবছি। শোন মারিউস, তোমরা যখন এসে কড়া নাড়লে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কি ভাবছিলাম, জান?—ভাবছিলাম, সব ত শেষ হয়ে গেল, তোমাদের আর দেখতেও হয় ত পেলাম না। ওই দেখ, ওর ছেলেবেলার জামাটি। একটু আগে এটিকে বুকে চেপে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, কোজেৎকে ত আর শেষ সময়ে বুকে ধরতে পেলাম না, তার জামাটিই সে অভাব পূরণ করুক। ঠিক তোমাদের আসবার একটু আগেই এ সব ভাবছিলাম। সত্যি, আমি কি বোকা! মানুষ বোকা হলে কি হয়, ভগবান ব্যবস্থা করেন অন্য রকম। দুঃখে কষ্টে পড়লে মানুষ ভাবে দুনিয়ার সকলেই বুঝি তাকে পরিত্যাগ করেছে। না, তা ত হয় না। মনে মনে একান্ত করে যে কামনা করেছিলাম, ভগবান সে কথা জেনেই না আমার কামনা পূর্ণ করলেন, তোমরা এলে। আজ শুধু আমার মাকেই নয়, আমার সেই দশ বছর আগেকার কোজেৎকেও যে ফিরে পেলাম। তোমাদের দেখতে না পেলে কি কষ্টই না হত আমার!'

বলতে বলতে বুড়ো একটু অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তার পর একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন :

'একান্ত করেই কোজেৎকে আমার শেষ মুহূর্তে দেখতে চেয়ে ছিলাম। নিজেকেই নিজে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, তারা ত তোমাকে চায় না, তুমি কেন তবে তাদের জন্যে কেঁদে মর! চিরকালই

যে তারা তোমার খেজমৎ করতে পারবে এরকম আশা করাও তোমার উচিত নয়। কিন্তু ভগবানের কি অসীম করুণা! তোকে আবার দেখতে পেলাম। বাঃ, সুন্দর জামা পরেছিস ত মা-মণি! এ রঙটা আমার ভারী ভাল লাগে। মারিউস কিনেছেন, না? ওর ত দেখছি বেশ পছন্দ!'

কোজেৎ বলতে লাগল, 'কিন্তু বাবা, এত নিষ্ঠুর তুমি ত কোন দিনই ছিলে না! কেমন করে এত নিষ্ঠুর তুমি হলে, আমি শুধু তা-ই ভাবি! এক সময় ছিল যখন তুমি তোমার কোজেৎকে এক লহমা চোখের আড়াল করতে না, সেই তুমিই আজ কত দিন তাকে একটিবার দেখতেও যাও নি! এত দিন কোথায় ছিলে বাবা? আগে তিন-চার দিনের বেশি আমাকে না দেখে থাকতে পারতে না, কিন্তু এবারে কত দিন হয়েছে জান? চাকরটাকে কতদিন পাঠিয়েছি তোমার খবর নিতে কিন্তু প্রতিবারেই একই জবাব নিয়ে সে গেছে, 'কর্তা ফেরেন নি।' কবে এলে? কোথায় গিয়েছিলে? একটা খবরও কি দিতে নেই? কি অপরাধ করেছি আমি? তোমার শরীর যে এমন করে ভেঙে পড়েছে, তা কি তুমি জানতে না? তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ! এবার থেকে তোমাকে দস্তুর মত শাসন করতে হবে। এত অসুখ তোমার, আমাদের একটু খবর দিলে না! ভাগ্যে আজ এসে পড়েছিলাম, তা-ই!'

ভাল্জাঁ বার বার মারিউসের দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'তুমি সত্য সত্যই এলে মারিউস? আমার সকল ত্রুটি সকল দোষ ক্ষমা করতে পেরেছ ত?'

এতক্ষণ মারিউস কোন কথা বলবার সুযোগ পায় নি, এবার বাঁধমুক্ত স্রোতস্বতীর মত তার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস পথ পেল। সে বলতে লাগল, 'শুনছ কোজেৎ, উনি আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন। জান উনি আমার জন্যে কি করেছেন? আমাকে বাঁচিয়েছেন, সেই বিপ্লবের দিনে অবরোধে

যখন আহত হয়ে পড়েছিলাম তখন উনিই আমাকে সেই নর্দমার ভিতর দিয়ে নিয়ে আমার দাদামশায়ের বাড়ী পৌঁছে দেন। আরও অনেক কিছু করেছেন, তোমাকে আমার হাতে দিয়েছেন। কিন্তু জীবন বাঁচিয়ে এবং তোমায় দিয়ে নিজের জন্যে কি করেছেন জান? নিজেকে বলি দিয়েছেন। এই মানুষ উনি! আর আমি—আমার দয়া নেই, মায়া নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, সহানুভূতি নেই—কিছু নেই—সেই আমাকেই কি-না উনি বলছেন, 'ক্ষমা কর!' সারা জীবন ধরে ওঁর পদসেবা করলেও উনি আমার জন্যে যা করেছেন তার তুলনা হয় না। সেই যুদ্ধক্ষেত্র, সেই দুর্গন্ধময় নর্দমা, সেই অন্ধকূপ—সব তিনি উপেক্ষা করেছেন শুধু তোমার ও আমার জন্যে, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে সেই দিন কত কষ্টই না পেয়েছেন শুনলে অবাক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করতে চাইবে না। বলবে, মানুষ কি তা পারে? কিন্তু উনি পারেন, উনি মানুষ নন—মানুষের আকৃতিতে দেবতা। কি দুর্জয় সাহস, কি অসীম কর্তব্য-পরায়ণতা, কি অকৃত্রিম সহৃদয়তার যে তিনি আধার, তা বলে শেষ করা যায় না।'

ভাল্‌জাঁ অস্পষ্ট অনুযোগের সুরে বললেন, 'থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। এ সব কেন বলছ? আর আমি যদি কিছু করেই থাকি, তা সব পিতাই তাঁদের সন্তানদের জন্যে করে থাকেন। সে আর এমন বেশি কি!'

মারিউস বাধা না মেনে পুনরায় বলতে লাগল, তার স্বরে শ্রদ্ধা, ভক্তি, দরদ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সে বলছিল, 'কিন্তু, আপনি কেন আমাকে এ সব কথা সেদিন বলেন নি? আপনারই ত দোষ। আপনি লোকের জীবন রক্ষা করেন, আর সে খবর তাদের জানতে দেন না! আপনি সাংঘাতিক লোক! নিজের দোষটাই লোকের কাছে বলে বেড়ান, গুণটা গোপন রাখেন। লোকেরা মনে করে আপনি শয়তান। কি ভুলই না হয়েছে আমার!'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'সত্যি কথাই ত সেদিন তোমাকে বলেছি, মিথ্যে ত কিছু বলি নি।'

মারিউস বলে উঠলেন, 'মিথ্যে কিছু যে বলেন নি, সে কথা সত্যই, কিন্তু সত্যও ত সব বলেন নি, অনেক কিছুই ত গোপন করেছেন। আপনিই যে এম্—শহরের ভূতপূর্ব মেয়র মঁসিয়ো মাদলেন, কই, সে কথা ত আমাকে বলেন নি। কেন বলেন নি? আপনি আপনার পরম শত্রু ইন্সপেক্টর জাভেয়রের প্রাণ রক্ষা করেছেন, কই, সে কথা ত বলেন নি! আমার জীবন রক্ষা করে নর্দমার মধ্য দিয়ে কত কষ্টে যে বেরিয়ে এসেছিলেন, সে কথা ত আমাকে বলেন নি!'

'বলি নি, তার কারণ, আমি ত ঠিক তোমার মতই মনে করেছিলাম যে, এর পর আর আমার তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা সঙ্গত হবে না। তোমার আহত অচেতন দেহ নিয়ে সেই নর্দমা-পথে যাত্রার কথা তখন যদি তুমি জানতে পারতে তা হলে আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আমাকে কখনও কাছ-ছাড়া করতে না, তাই বাধ্য হয়েই আমি তখন সে সব কথা বলি নি। যদি বলতাম তা হলে আজ পথে থাকতে হত।'

'পথে থাকতে হত? তার মানে?—যাক, আপনি কি এখনও এ বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করেন যে, এর পরও আপনাকে এই জীর্ণ বাড়ীতে একা অসহায় ভাবে থাকতে হবে? আপনাকে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, আর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি নে। আপনি কোজেৎ-এর বাবা, আমারও। আমরা আর আপনার কোন ওজুহাতই শুনব না, একটি দিনও আর আপনাকে ছেড়ে দেবো না।'

ভাল্‌জাঁ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মৃদু হেসে বললেন, 'একটি দিন কি আর আমিই থাকতে চাই, না, চাইলেই থাকতে পারব? তবে তোমাদের ওখানেও আমার যাওয়া হবে না বাবা!'

কোজেৎ পিতার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। ভাল্‌জাঁর চোখের কোণে দু বিন্দু অশ্রু এসে জমা

হল—যেন তাঁর প্রাণ গলে দু বিন্দু অশ্রুরূপে চোখের কোণে এসে দুটি সাদা মুক্তার মত টল্‌ টল্‌ করতে লাগল।

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'ঈশ্বর যে করুণাময়, এই পরম সত্যটি আমি আজ এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধি স্থলে দাঁড়িয়ে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি। মারিউস, তোমরা দু জনে যখন এই ঘরে এসে প্রবেশ করলে, ঠিক তার আগের মুহূর্তেই আমার অন্তরের অন্তস্তলে খুঁজতে গিয়ে ত আর কাউকে সেখানে পেলাম না,—পেলাম আমার মাকে, আমার কোজেৎকে!

'কোজেৎ, মা আমার, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি আর বেশি ক্ষণ তোমাকে দেখবার ফুরসৎ পাব না। এসো মা আমার, তোমাকে শেষবার দেখে নিই। দৃষ্টিশক্তি আমার যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কোজেৎ তার মুখখানি ভাল্‌জাঁর মুখের সুমুখে এগিয়ে নিয়ে গেল। তিনি কন্যার ললাট চুম্বন করলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি বরফের মত শীতল।

কোজেৎ চমকে উঠে বলল, 'বাবা, তোমার ঠোঁট এত ঠাণ্ডা! তোমার কি অসুখ? বড় বেশি কি কষ্ট হচ্ছে?'

ভাল্‌জাঁ বললেন, 'কষ্ট?—কই, না। তবে—'

কোজেৎ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তবে কি বাবা?'

ভাল্‌জাঁ চুপি চুপি জবাব দিলেন, 'তবে কি? শুনবি মা?—মরণ আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে। ওই দেখ!'

কোজেৎ ও মারিউস আতঙ্কে শিউরে উঠল।

মারিউস চেঁচিয়ে উঠল, 'মরণ!'

'হাঁ বাবা, মরণ। তাতে দুঃখ করবার কি আছে? তোমরা কি বলতে চাও—আমি চিরকালই বেঁচে থাকব?'

এই বলে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু হাসলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তা মিলিয়ে গেল।

ভাল্‌জাঁ বলে চললেন, 'এমন মরণ কার ভাগ্যে হয়? এ আমার সুখের মরণ! কোজেৎ, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছ; আমার আর

কোন দুঃখ নেই। যতটুকু সময় বেঁচে আছি, শুধু তোমার মধুমাখা কণ্ঠস্বর আমাকে শোনাও মা।'

মারিউসের দেহ রোমাঞ্চিত হল, সে ভয়ে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে সে বলে উঠল, 'না বাবা, আপনি মরবেন না, আমরা আপনাকে মরতে দেবো না।'

ক্ষীণ হেসে তিনি বললেন, 'মরতে কি আমিই চাইছি? কিন্তু না চাইলেই কি জোর করে মরণকে ঠেকাতে পারব?'

মারিউস বলল, 'আপনার দেহে এখনও বেশ বল আছে, স্মরণশক্তি কিছুমাত্র কমে নি—এ অবস্থায় মরণ কেমন করে সম্ভব?'

ভাল্‌জাঁ ঈষৎ হেসে সস্নেহে একবার মারিউস ও কোজেৎ-এর মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন, 'মারিউস, তুমি আমার মরণে আপত্তি করছ। কি জানি, ভগবানের কি ইচ্ছা! জানি নে, হয় ত তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তোমাদের আসার ঠিক একটু আগেই আমার মনে হয়েছিল, এই বুঝি দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে যায়। প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। তার পর তোমরা এলে, মরণ যেন বাধা পেল। হয় ত শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচেও যেতে পারি। কিন্তু বেশ জানি, আমার আর বাঁচবার অধিকার নেই, সময় হয়ে গেছে, তার জন্যে তৈরি হয়েই আছি। এখন আর আমার কোন কামনা নেই। আজ এই তৃপ্তিটুকু নিয়েই আমি যেতে পারছি যে, আমার কোজেৎকে তুমি সুখী করবে।'

ঠিক এই সময় ডাক্তার এলেন। তাঁকে দেখে ভাল্‌জাঁ বলে উঠলেন, 'এই যে বন্ধু, এসেছ? সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবারের মত বাঁধন ছিঁড়ে চললাম! তোমাদের স্নেহ-প্রীতি আমার একমাত্র পাথেয়। ডাক্তার, আমার মেয়ে-জামাই এসেছে। ওই দেখ আমার কোজেৎ!'

মারিউস ডাক্তারের সম্মুখে গিয়ে তাঁর দিকে করুণ মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

ডাক্তার তখন রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছেন। একবার মাথা তুলে মারিউসের দিকে নীরবে তাকালেন, তার অর্থ—সময় হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই।

মুখে বললেন, 'অসুখে পড়ে অবধি কেবল তোমাদের কথাই বলতেন।'

ভাল্‌জাঁ সবই বুঝতে পারছিলেন আপন মনেই বললেন, মরণ তোমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, কিন্তু তাই বলে ঈশ্বর ত অবিচার করেন না'

এই বলে, কি মনে করে একটু হাসলেন। আবার বললেন, 'মরাটা কিছু নয়। কিন্তু বেঁচে থাকতে না পারাটাই দুঃখের'

হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার ও মারিউস দুজনেই তাঁকে ধরতে গেলেন ক্রুশে বদ্ধ যীশুখৃষ্টের একখানা চিত্র দেয়ালে ঝুলানো ছিল, নিজের হাতে সেটি তুলে এনে নিজের আসনের সামনে ছোট একটি টিপয়ের উপর বসিয়ে দিয়ে আপন মনেই বলে উঠলেন 'এর মত বড় শহীদ পৃথিবীতে কখনও জন্মায় নি।'

আস্তে আস্তে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। দারুণ উত্তেজনায় দেহ অবসন্ন। দেহ থেকে প্রাণটা যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। কোজেৎ সস্নেহে পিতাকে জড়িয়ে ধরে পিতার মাথাট নিজের কাঁধে তুলে নিল। কোজেৎ কথা কইতে চাইচে, কিন্তু আটকে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছিল আর বলছিল, বাবা, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। তোমাকে চিরদিনের মত হারাব বলেই কি এতদিন পর তোমাকে পেলাম!'

ইতিমধ্যেই ভাল্‌জা একটু সামলে উঠলেন। তাঁকে দেখে তখন আর তত আশঙ্কা মনে জাগে না। মারিউস তাই দেখে বলে উঠল, 'ডাক্তার মহাশয়, দেখুন ত, একটু যেন ভাল বোধ হচ্চে না?'

ভাল্‌জাঁ সহাস্যে বললেন, 'মারিউস, বাবা, আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে গেলেও কি মরণের হাত থেকে ধরে রাখতে পারবে?

তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। আমার এখন যাওয়াই উচিত, বয়সও ত হয়েছে। আমার কথা শোন তোমরা অধীর হয়ো না। হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। বেশ বুঝছি, এ যাত্রা আর আমার এড়াবার কোন উপায় নেই। কোজেৎ মারিউস তোমাকে সুখী করবে। আমার কাছে কত দুঃখকষ্ট পেয়েছ, এবার নিজের ঘরে সুখী হও আমি কায়মনোবাক্যে এই আশীর্বাদ করছি।'

তিনি সাদরে কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন।

তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'কোজেৎ, মারিউস, একটি কথা তোমাদের দুজনকে বলবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। যে টাকাটা তোমাদের যৌতুক দিয়েছি, তার একটি পয়সাও অসদুপায়ে অর্জন করি নি। আজ মরতে চলেছি, আজ আর মিথ্যে বলে কোন লাভ নেই, ও টাকার সবই সৎ উপায়ে উপার্জন করেছি। মনে কোন সন্দেহ না রেখে ও টাকাটা তোমাদের প্রয়োজনে ব্যয় করবে এই আমার একান্ত অনুরোধ। আর একটা কথা, যে নকল চুণির কারবার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলাম, তার আবিষ্কার আমারই, সে কৌশল আর কেউ জানে না। কেমন করে সমগ্র ইউরোপে সে পণ্য চালিয়েছিলাম, বিস্তৃত ভাবে তা সব একটি খাতায় লিখে রেখেছি। যদি সম্ভব হয়, তোমরা সে ব্যবসা করতে পার। আমার দেওয়া অর্থ ও এই ব্যবসাটি তোমরা গ্রহণ করলে আমি অত্যন্ত সুখে মরতে পারি।'

ভাল্‌জাঁর ঝি বুঝতে পেরেছিল যে, মনিব আর বাঁচবেন না। সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে যা দেখল, তাতে তার মনে আর একটুও সন্দেহ রইল না যে, অবস্থা ভাল নয়। সে আস্তে আস্তে প্রভুর সামনে গিয়ে বলল, 'পাদরীকে ডাকব?' ভাল্‌জা আঙুল দিয়ে শিয়রের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার পাদরী ত রয়েছেন! ওই দেখ, তিনি অনেকক্ষণ থেকে ওইখানে এসে দাঁড়িয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।'

তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে বিশপ মিরিয়েলের অমর আত্মা ছায়ামূর্তিতে এসে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কোজেৎ ও মারিউসকে তাঁর কাছে সরে আসতে ইসারা করে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি। কোজেৎ, তুমিও আমাকে ভালবাস, তা জানি। আমি মরে গেলে তুমি আমার জন্যে কাঁদবে!—আমি যাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমাকে যার কাছে রেখে গেলাম সে তোমার মর্যাদা বুঝে তোমাকে সুখী করবে। তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসে, আমি জানি। আমার যা-কিছু ছিল সব তোমাকে দিয়েছি, কারণ, তুমি ছাড়া এ জগতে আমার আর কেউ নেই। আশা করি, তুমি আমার দেওয়া অর্থের সদ্ব্যয় করবে। মা, আমার মাথার উপরের তাকে দুটি রূপোর বাতিদান আছে। তুমি নিজের হাতে ওই বাতিদান দুটিতে বাতি জ্বালিয়ে দাও। বাতিদান দুটি রূপোর কিন্তু আমার কাছে তা অমূল্য সম্পদ। এই বাতিদানে যে বাতি জ্বলবে তা হোমাগ্নি-শিখার মত পবিত্র। জানিনে, যে মানুষের আকারে দেবতা আমাকে এ দুটি দিয়েছিলেন তিনি পরলোক থেকে এই সময় আমার উপর তাঁর চির-করুণার দৃষ্টিতে চাইছেন কি না। জানিনে, আমার কাজে তিনি প্রসন্ন হতে পেরেছেন কি না। তবে আমার যতটুকু সাধ্য ছিল, আমি তা করেছি। মনে রেখো, আমি বড় গরীব। আমার সৎকারে যেন কোন রকম ব্যয়বাহুল্য না হয়। মারিউস, এই শেষ মুহূর্তে আর কোন কথাই গোপন রাখব না। শোন, আমি স্বীকার করছি যে, তোমার ও কোজেৎ-এর মিলনে আমার প্রথমটায় মত ছিল না। কেন, তা বলতে পারি নে, সম্ভবত সংস্কার! আমার মন বলছিল ঃ এ যুবকই একদিন আমার বুক থেকে কোজেৎকে কেড়ে নেবে। সে যাই হোক, এখন কোজেৎ ও তুমি, আমার চোখে দু-ই এক। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,—তুমি আমার কোজেৎকে সুখী করেছ। কোজেৎ, ওই দেরাজে

পাঁচখানা একশ টাকার নোট আছে, আমার সৎকারের পর তা গরীব দু:খীদের বিলিয়ে দিও। আর বিছানার উপর ওই যে ছেঁড়া জামাটি দেখছ, ওটি চিনতে পার? মোটে দশ বছর আগেকার! সময় কত শীঘ্র চলে যায়!

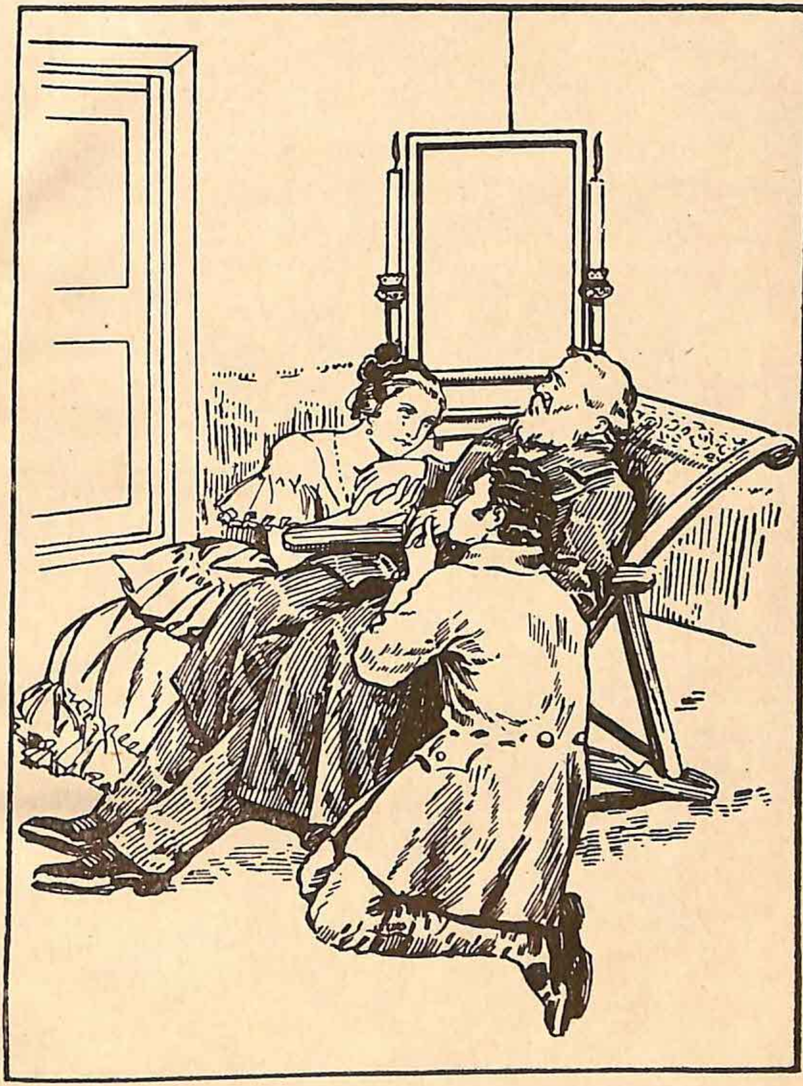
'কোজেৎ, তোমার মায়ের কথা হয় ত তোমার কিছুই মনে পড়ে না। তার নাম হয়ত তুমি জান না। তোমার মায়ের নাম ছিল ফাঁতিন। নামটা মনে রেখো—ফাঁতিন। যখনই তোমার মায়ের কথা মনে হবে তখনই ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা করো। তোমার মা সমস্ত জীবন বড় কষ্ট পেয়ে গেছেন। একদিনের জন্যেও এতটুকু সুখের মুখ দেখতে পাননি। কিন্তু তিনি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। তাঁর ভাগ্যে চিরদুঃখ—তোমার ভাগ্যে সুখ। ভগবানের এই বিধান।

'কোজেৎ, মারিউস, চললাম। তোমরা দুজনে আমার দুপাশে বসো। আরও একটু সরে এসো. আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও!

কোজেৎ ও মারিউস দুজনে হাঁটু গেড়ে ভালজার দুপাশে বসল। তাঁর মৃত্যু-শীতল হাত দুখানি দুজনে ধরে রইল। হাত দুখানার স্পন্দন থেমে গেছে। ভালজার মুখে স্বর্গীয় সুষমা, দিব্য জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর চোখ দুটি আকাশের দিকে বোধ করি ভগবানের পদপ্রান্তে গিয়ে সে দৃষ্টি পৌঁছেছে।

আকাশে একটিও তারা নেই। ভালজার দুঃখময় কর্মময় বিচিত্র জীবননাট্যের যবনিকাপাত হয়ে গেল।

শেষ



কোজেৎ ও মরিউস হাঁটুগেড়ে ভাল্‌জাঁর দু পাশে বসল